NOBI SALLALLAHU ALAIHI WA SALLAMER

SALAT SOMPADONER PODHDHOTI

Muhammad Nasiruddin al-Albani

Tawheed Publications

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি

"তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত এমনভাবে যেন আপনি দেখছেন।"

মূল

যুগশ্রেষ্ঠ প্রকৃত আল্লামাহ ও মুহাদ্দিছ

মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও সম্পাদনা

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

লীসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর

লীসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত

বাংলাদেশ অফিস কর্তৃক মুদ্রিত

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি

মূল ঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় ঃ আবু রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর
আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

প্রকাশনায় ঃ রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত
বাংলাদেশ অফিস।

প্রথম প্রকাশ ঃ রবিউস সানী ১৪২৩ হিজরী, জুলাই ২০০২ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ শা'বান ১৪২৪ হিজরী, অক্টোবর ২০০৩ ঈসায়ী

[FOR FREE DISTRIBUTION * বিনামূল্যে বিতরণের জন্য]

কম্পিউটার, ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১৭১-৬৪৬৩৯৬
e-mail : tawheedpp@bdonline.com

সূচীপত্র

অনুবাদক ও সম্পাদকের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। অসীম ছলাত ও সালাম বর্ষিত হতে থাক শেষ নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর।

আল্লাহর অসীম রহমতে বিশ্বের সর্বসেরা ও বিশুদ্ধ ছলাত শিক্ষার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইটি সযত্নে অনুবাদ ও সম্পাদনা সমাপ্ত হয়ে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। বইটির আরবী নাম– صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها বাংলায় নাম– "**নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত এমনভাবে যেন আপনি দেখছেন।**"

মূল লিখক বিশ্ববরেণ্য প্রকৃত মুহাদ্দিছ ফাকীহ্ আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আলবেনিয়ার তৎকালীন রাজধানী ইশকূদারে একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাযহাবগতভাবে তাঁর পিতাসহ গোটা পরিবার এমনকি তিনিও প্রথম দিকে হানাফী মাযহাবভুক্ত ছিলেন। ছোটকালে তিনি তাঁর পিতার নিকট মুখতাছার কুদূরী পড়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি কাঠমিস্ত্রী ছিলেন অতঃপর তিনি তাঁর পিতার পেশা ঘড়ির মেরামতের কাজ শিখে সেই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এ সময় অবসরের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন কিতাব-পত্র পড়ার সুযোগ পান। আল্লামাহ রাশীদ রেজার "আল মানার" ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত, গযালীর ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের জাল যঈফ হাদীছ পড়ে তিনি সর্বপ্রথম হাদীছ যাচাই-বাছাই-এর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন এবং হাদীছ গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আল্লাহ তাঁর জন্য কুরআন হাদীছের ইলমের ভাণ্ডার খুলে দেন। হাজার বছরেরও বেশী কাল ধরে হাদীছ শাস্ত্রের যে খিদমত হয়নি, তিনি বিংশ শতাব্দীতে তা করার তাওফীক লাভ করেন। সুনান আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাতুল মাছাবীহ ও আল জা-মিউছ্

ছাগীরসহ বহু হাদীছগ্রন্থ গবেষণা করে তার ছহীহ হাদীছ এবং যঈফ ও মাওযূ হাদীছ চিহ্নিত করেছেন। এমনকি সুনান আরবাআহ্ (পূর্বোক্ত চারখানা কিতাব), আল-জামিউছ ছাগীর ও আল-আদাবুল মুফরাদ ইত্যাদি হাদীছ গ্রন্থকে ছহীহ যঈফ দুইভাগে ভাগ করে দিয়েছেন। ছহীহ হাদীসগুলো আলাদা খণ্ডে এবং যঈফগুলো আলাদা খণ্ডে। আরব বিশ্বের প্রায় সমস্ত লাইব্রেরীতে এভাবে বিক্রি হচ্ছে। আমরাও নিয়ে এসেছি। এছাড়াও ছহীহ হাদীছ এবং যঈফ মাওযূ হাদীছের ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব সংকলনও রয়েছে। সিলসিলাতুল আহাদীছিছ্ ছাহীহা এ যাবৎ তার ৮ খণ্ড বাজারে বেরিয়েছে এবং সিলসিলাতুল আহাদীছিয্ যা'ঈফাহ্ অল্-মাওযূআহ– যার এযাবৎ ৭ খণ্ড বাজারে বেরিয়েছে। বিভিন্ন ফিক্বহ ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী গ্রন্থের ভিতর উদ্ধৃত হাদীছগুলো তাহক্বীক (যাচাই) ও তাখরীজ (উদ্ধৃতি উৎস উল্লেখ) করেছেন। তাঁর লিখিত, সংকলিত, গবেষণা ও সম্পাদনাকৃত এবং মুদ্রিত অমুদ্রিত পুস্তক সংখ্যা ২১৫ খানা। অদূর ভবিষ্যতে প্রায় চল্লিশ খণ্ডে সমাপ্ত তার ফতুয়ার কিতাব প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

এ কিতাবখানা তাঁর ২১৫ খানা গ্রন্থের একখানা। বইখানা সারা বিশ্বেই প্রসিদ্ধ। প্রায় সকল ভাষাতেই তা অনূদিত হয়েছে। আরবীতেই বইখানা ২০ বারেরও বেশী পুণর্মুদ্রিত হয়েছে। তার সমস্ত কিতাবই প্রায় ইলমী কিতাব যা আলিম সমাজের জন্য বেশী প্রযোজ্য। সাধারণ পাঠকের তাঁর লিখিত কিতাব থেকে উপকৃত হতে হলে ধৈর্যসহ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়তে হবে। তিনি এক বিষয়ের উপর লিখিত কিতাবে প্রসঙ্গক্রমে অনেক স্থানে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে থাকেন। তাই অধৈর্য পাঠকের জন্য তার কিতাব থেকে উপকৃত হওয়া কঠিন হয়ে যায়। এজন্য আমরা প্রসঙ্গক্রমে ও বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষে উল্লেখিত পুস্তকের সাথে সামঞ্জস্যহীন অথবা দূরবর্তী সামঞ্জস্যশীল তথ্যগুলোর জন্য আলাদা সূচিপত্র সংযোজন করেছি।[১] এতে করে পাঠক এক বই এর ভিতরই যেন দু'টি বই পেয়ে যাচ্ছেন। আমাদের এই অনুবাদের আসল বৈশিষ্ট্য এই যে, লিখকের মূলগ্রন্থ এবং তারই বসানো উক্ত কিতাবের নিম্নাংশে উল্লিখিত সমস্ত টীকা অনুবাদ করেছি। কেবলমাত্র একটি স্থান ছাড়া। যার প্রতি কারণ উল্লেখসহ যথাস্থানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটের দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী কয়েকটি স্থানে অনুবাদক ও সম্পাদকের টীকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

---

[১] এ সকল তথ্যের জন্য মূল বই-এ কোন শিরোনাম ব্যবহার করা হয়নি, তাই সম্মানিত পাঠক মহোদয়কে কষ্ট করে সূচীতে নির্দেশিত পৃষ্ঠায় তথ্যটি খুজে নিতে হবে। সূচীটি বই-এর শেষে যোগ করা হয়েছে।

লেখক কিতাবে ছলাতের মৌলিক অমৌলিক খুঁটিনাটি সমস্ত নিয়ম পদ্ধতি অর্থাৎ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছলাতে যা যা করতেন তার প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা শিরোনামে নির্ধারণ করে তার আওতায় হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহ তথ্য উল্লেখ করেছেন। শুধু ছহীহ ও হাসান হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নিয়মগুলোই তিনি নিয়েছেন। যঈফ বা মাওযূ (বানোয়াট) হাদীছ থেকে যে সমস্ত নিয়ম পাওয়া যায় তা তিনি উল্লেখ করেননি। তবে অনেক সময় সে সব নিয়ম পালন থেকে সতর্ক করার জন্য টীকায় ঐ যঈফ ও বানোয়াট হাদীছগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং কতকগুলো ইবারতসহ উল্লেখ করেছেন।

ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছলাত আদায় করলে এবং এ বিষয়ে কিছু বাহ্যত দ্বন্দ্বপূর্ণ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু সমন্বয়ের দিকে গেলে তাতে মাযহাবগত কোন ভেদাভেদ থাকবে না। মূলতঃ ছলাতের ক্ষেত্রে মাযহাবগত যে পার্থক্য দেখা যায় তা দুর্বল ও জাল বানোয়াট হাদীছের অনুসরণ ও ছহীহ্ হাদীছের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না করে মাযহাবী টানাহিচড়ার কারণে। অথচ যাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করা হয়েছে তারা শুধু কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছ মানার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং ছহীহ হাদীছকে তাদের মাযহাব বলে ঘোষণা করে গেছেন। তারা কস্মিনকালেও তাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি করতে বা তাদের তাকলীদ করতে বলেননি বরং তারা তাঁদের দলীলবিহীন কথা ও ফতওয়া গ্রহণ করতে নিষেধ ও হারাম করেছেন। লিখকের ভূমিকায় বিস্তারিতভাবে তাদের এ সম্পর্কে উক্তি ও উপদেশগুলো দেখতে পাবেন। চারজন ইমামের উক্তি ও উপদেশগুলোর মাধ্যমে ছলাত আদায়ের যে পদ্ধতি সাব্যস্ত হয় তা হলো অত্র কিতাবে বর্ণিত পদ্ধতি। এ বইয়ে বর্ণিত পদ্ধতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিশ্বাসী সকল মুসলিম জাতির জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি– তাঁরা যে দল ও যে মাযহাবেই পরিচিত হোন না কেন। আল্লাহ সকলকে বইখানার আলোকে সঠিকভাবে ছলাত আদায় করার তাওফীক দান করুন। আর এর লিখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং যারা এ বইখানা ছাপানোর ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা, শ্রম, পরামর্শ ও উৎসাহ দান করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন– "আমীন"।

অনুবাদক ও সম্পাদক

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দাদের উপর ছলাত ফরয করেছেন এবং তাদেরকে এটি প্রতিষ্ঠিত করার ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাকে খুশু' খুযুর সাথে আদায় করার মধ্যে সফলতা নিহিত করেছেন। ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী এবং নির্লজ্জতা ও অন্যায় কাজ থেকে বারণকারী বলে গণ্য করেছেন।

ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর যাকে আল্লাহ্ তা'আলা এই বলে সম্বোধন করেছেন ঃ

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

অর্থ ঃ আমি (আল্লাহ্) আপনার প্রতি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি মানুষকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ বিষয় ব্যাখ্যা করে দেন।[১]

তিনি এই দায়িত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে গেছেন। তিনি মানব জাতির জন্য কথা ও কাজের মাধ্যমে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হচ্ছে ছলাত। একদা তিনি মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে এবং রুকু করে ছলাত পড়েন। অতঃপর (ছাহাবাদেরকে) বলেন ঃ "আমি এমনটি করলাম এজন্য যাতে করে তোমরা আমার অনুকরণ করতে পার এবং আমার ছলাত শিখতে পার।"[২]

তিনি আমাদের উপর তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছেন। তাঁর বাণী হচ্ছে ঃ

صلوا كما رأيتموني أصلي ﴾

অর্থ ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে ছলাত পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে ছলাত পড়।[৩]

যে ব্যক্তি তাঁর ছলাতের মত ছলাত পড়বে তাকে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন এ মর্মে যে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বলে ওয়াদা করেছেন যেমন তিনি বলেন ঃ

---

(১) সূরা নাহল ৪৪ আয়াত

(২) বুখারী ও মুসলিম; ছলাতের কিয়াম সম্পর্কে আলোচনায় হাদীছটি পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হবে।

(৩) বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ। হাদীছটি-- إرواء الغليل কিতাবে ও ২১৩ নং হাদীছের অধীনে উদ্ধৃত হয়েছে।

خمس صلوات افترضهن الله عزوجل، من احسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، كان له علي الله عهد ان يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له علي الله عهد، إن شاء غفرله، وإن شاء عذابه ﴿

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ পাঁচ (ওয়াক্ত) ছলাত ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলোর জন্য উযু সুন্দরভাবে সম্পাদন করবে, আর ঠিক সময় মত তা আদা করবে, এর রুকু, সাজদা ও খুশুখুযূ (বিনয়ভাব) পূর্ণমাত্রায় পালন করবে, আল্লাহ তার ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, আর যে এমনটি করবেনা তার ব্যাপারে আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন আর তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।[১]

আরো দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুণ্যবান মুত্তাকী ছাহাবাদের উপর যারা আমাদের জন্য তাঁর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবাদত, ছলাত, কথা এবং কাজগুলোর বিবরণী সংকলন করেছেন আর কেবল এগুলিকেই তাঁদের মাযহাব ও আদর্শ হিসাবে গণ্য করেছেন। এমনিভাবে যারা তাদের মত কাজ করবে ও তাদের পথ ধরে চলবে– প্রলয়কাল পর্যন্ত; তাদের উপরও বর্ষিত হোক দরুদ ও সালাম।

অতঃপর আমি যখন হাফিয মুনযিরী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর الترغيب والترهيب গ্রন্থের ছলাত অধ্যায়ের পঠন ও কিছু সালাফী ভাইদেরকে এর পাঠ দান শেষ করলাম– যা চার বৎসর যাবৎ চলেছিল– এ থেকে আমাদের প্রত্যেকের কাছে ইসলামে ছলাতের অবস্থান ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আরও জানতে পারি, যে ব্যক্তি একে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে তার জন্য কি প্রতিদান, মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাতের সাথে এর মিল ও গরমিলের উপর পারিতোষিকে কম বেশি হয়। যেমন তিনি হাদীছে বলেন ঃ

إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلاعشرها، تسعها، ثمنها سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها ﴿

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই (কিছু) বান্দাহ এমন ছলাতও পড়ে যার বিনিময়ে তার জন্য কেবল ছলাতের এক দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশে লিখিত হয়।[২]

---

(১) লিখক বলেন ঃ এটি ছহীহ হাদীছ, একে একাধিক ইমাম ছহীহ বলেছেন, আমি একে ছহীহ আবূ দাউদের (৪৫১ ও ১২৭৬) নম্বরে উদ্ধৃত করেছি।

(২) হাদীছটি ছহীহ, ইমাম ইবনুল মুবারক এটাকে الزهد কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন, আবূ দাউদ ও নাসাঈ উত্তম সনদে তা বর্ণনা করেছেন আমি (লিখক) ছহীহ আবূ দাউদে (৭৬১) নম্বরে তা উদ্ধৃত করেছি।

এজন্যই আমি ভ্রাতৃমণ্ডলীকে অবহিত করেছিলাম যে, এই ছলাতকে যথাযোগ্য বা তার কাছাকাছি রূপে সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব নয় যতক্ষণ না রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত সম্পাদন পদ্ধতিকে বিশদভাবে জানতে পারব, যেমন ছলাতের ওয়াজিব ও আদাবসমূহ, তার অবস্থাদি, দু'আ ও যিকরসমূহ, তার পর বাস্তব জীবনে এগুলোকে রূপায়নে মনোযোগী হব। এসবের পর আমরা আশা করতে পারি যে, আমাদের ছলাত আমাদেরকে নির্লজ্জ কাজ ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে এবং ছলাতের বিনিময়ে যেসব ছওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে আমাদের জন্যে তা লিখা হবে। কিন্তু এসবের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ বেশিরভাগ লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার এমনকি অনেক আলিমদের উপর তা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়– নির্দিষ্ট কোন মাযহাবে আবদ্ধ থাকার কারণে। আর পবিত্র সুন্নাহ (হাদীছ) গ্রন্থের সেবা, সংকলন, অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি মাত্রই একথা জানেন যে, প্রত্যেক মাযহাবেই কিছু এমন সুন্নাত রয়েছে যা অন্য মাযহাবে নেই, আর সমস্ত মাযহাবের মধ্যেই কিছু কথা ও কাজ এমন রয়েছে যেগুলির সম্বন্ধ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে বিশুদ্ধরূপে সাব্যস্ত নয়।

এইসব অশুদ্ধ হাদীছ বেশির ভাগই পরবর্তীদের (মুতাআখ্খিরীনদের) কিতাবাদিতে পাওয়া যায়।[১]

আমরা প্রায়ই তাদেরকে এ হাদীছকে দৃঢ়তার সাথে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] আবুল হাসানাত লক্ষ্ণৌভী স্বীয় কিতাব النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير এর মধ্যে হানাফী ফিক্বহের কিতাবসমূহের শ্রেণী বিন্যাস করে কোনটা নির্ভরযোগ্য আর কোনটা নির্ভরযোগ্য নয় তা উল্লেখ করে বলেন (১২২-১২৩ পৃঃ) ঃ "আমি কিতাবাদির যে শ্রেণী বিন্যাস উল্লেখ করেছি তা ফিক্বহী মাসআলা ভিত্তিক ছিল তবে যদি এতে সন্নিবেশিত হাদীছগুলোর আলোকে বিবেচনা করা যায়, তাহলে এই শ্রেণী বিন্যাস ঠিক থাকবে না। কারণ কতক কিতাব এমন রয়েছে যেগুলোর উপর সুযোগ্য ফুক্বাহাগণ নির্ভরশীল ছিলেন অথচ তা বানোয়াট (জাল) হাদীছ দ্বারা ভরপুর। বিশেষ করে ফাতওয়ার কিতাবগুলো যাতে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে একথাই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যে, এ সবের রচয়িতারা যদিও (ফিকাহ বিষয়ে) পরিপক্ক কিন্তু তারা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শিথিল।"

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যোগ্যতম আলিমদের কিতাবে বিদ্যমান এসব জাল বরং বাত্বিল হাদীছের মধ্যে রয়েছে–

من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة ۝

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রামাযানের শেষ জুমু'আয় বাদ পড়া কয়েক ওয়াক্ত ফরয ছলাত ক্বাযা পড়বে তার জীবনের ৭০ বৎসর পর্যন্ত ছুটে যাওয়া ছলাতের জন্য সম্পূরক হবে।

ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে সম্বন্ধ করতে দেখতে পাই।[১] তাই হাদীছ বিশারদগণ

লক্ষ্ণৌভী (রাহিমাহুল্লাহ) الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة কিতাবে (উক্ত) হাদীছ উল্লেখ করে বলেন (৩১৫ পৃঃ)।

আলী আল-ক্বারী তাঁর الموضوعات الكبرى ও الموضوعات الصغرى কিতাবে বলেন ঃ এটা সুনিশ্চিত বাত্বিল হাদীছ, কেননা এটা ইজমার পরিপন্থী। যেহেতু কোন ইবাদত বহু বৎসর যাবৎ ছুটে যাওয়া ছলাতের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাছাড়া আন্‌নিহায়াহ গ্রন্থের লিখকসহ হিদায়াহ্ গ্রন্থের অন্যান্য ভাষ্যকারদের উদ্ধৃতি ধর্তব্য নয় কেননা তাঁরা মুহাদ্দিছদের অন্তর্ভুক্ত নয়, আবার (এখানে) কোন হাদীছবেত্তার প্রতি তাঁরা এর সম্বন্ধও করেননি।

শাওকানীর الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة কিতাবে এ হাদীছটি উপরোক্ত শব্দের কাছাকাছি শব্দে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ "নিঃসন্দেহে এটি জাল হাদীছ আমি এটিকে ঐসব কিতাবাদিতে পাইনি যার লিখকগণ তাতে মাউযু হাদীছ সন্নিবেশিত করেছেন। তবে এটা বর্তমান যুগের صنعاء শহরের একদল ফক্বীহদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে আর তাদের অনেকেই এর উপর আমল করতে শুরু করেছে। আমার জানা নেই কে তাদের জন্য এটা বানিয়েছে। আল্লাহ মিথ্যুকদের অপদস্ত করুন।" (উদ্ধৃতি শেষ) ৫৪ পৃষ্ঠা।

অতঃপর লক্ষ্ণৌভী বলেন ঃ আমি হাদীছটি (জাল হওয়া সত্ত্বেও) দৈনন্দিন নিয়মিত পঠিতব্য অযীফাহ, যিকর ও দু'আর বইসমূহে সংকলন ভিত্তিক ও বিবেক ভিত্তিক প্রমাণাদিসহ দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত শব্দে পাওয়া যায় তাই তার জাল হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তিকা রচনা করেছি যার নাম হচ্ছে ঃ ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ॥

উক্ত পুস্তিকায় অনেক উপকারী কথা সন্নিবেশিত করেছি যার মাধ্যমে মস্তিষ্ক প্রখর হবে এবং যেগুলো কান পেতে শুনার মত। তাই এ নিয়ে অধ্যয়ন করা উচিত যেহেতু এ বিষয়ে তা অতি সুন্দর ও মানগত দিক দিয়ে উন্নত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ফিক্বহের কিতাবগুলোতে এ ধরনের বাত্বিল হাদীছ উদ্ধৃত হওয়ায় তাতে বিদ্যমান ঐসব হাদীছের বিশ্বস্ততা হারিয়ে দেয় যেগুলোকে নির্ভরযোগ্য কোন কিতাব এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়নি। আলী আল ক্বারীর বক্তব্যে একথার প্রতিই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই মুসলিম ব্যক্তির উচিত হবে হাদীছকে তার শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গ্রহণ করা।

তাইতো অতীতের লোকেরা বলেছেন ঃ "মক্কাবাসীগণ মক্কার রাস্তাঘাট সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত"। আর "ঘরের মালিক তাতে অবস্থিত জিনিস সম্পর্কে সমধিক অভিজ্ঞ।"

(১) ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) المجموع شرح المهذب এর প্রথম খণ্ডের ৬০পৃষ্ঠায় বলেন যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ আহলুল হাদীছ ও অন্যান্য মুহাক্কিক বিদ্বানগণ বলেন ঃ যঈফ হাদীছের ব্যাপারে একথা বলা যাবে না যে, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন অথবা তিনি করেছেন অথবা আদেশ দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন ইত্যাদি দৃঢ়তামূলক শব্দসমূহ। বরং এসব ক্ষেত্রে শুধু দুর্বলতামূলক শব্দ যেমন রসূল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে বা উদ্ধৃত হয়েছে ইত্যাদি। তারা বলেন ঃ দৃঢ়তা জ্ঞাপক শব্দাবলী ছহীহ ও হাসান হাদীছের জন্য প্রযোজ্য আর দুর্বলতা জ্ঞাপক শব্দগুলো অন্যান্য==

(আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন)-এসব কিতাবাদির কিছু প্রসিদ্ধ কিতাবের উপর অনুসন্ধান ও যাচাইমূলক কিছু গ্রন্থ রচনা করেন যা উক্ত কিতাবসমূহে উদ্ধৃত হাদীছগুলির ছহীহ, যঈফ ও জাল হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে বলে দেয়। যেমন ঃ العناية بمعرفة أحاديث الهداية (হিদায়ার হাদীছ অনুসন্ধানমূলক কিতাব আল-'ইনাইয়াহ) গ্রন্থ এবং الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل (খুলাছাতুদ্দালায়িল গ্রন্থের হাদীছ অনুসন্ধানের গ্রন্থ আত্তুরুকু অল ওয়াসায়িল) রচিত হয়েছে উভয়টাই শাইখ আব্দুল ক্বাদির বিন মুহাম্মদ আল কুরাশী আল হানাফীর প্রণীত, আরো রয়েছে হাফিয যায়লাঈর (হিদায়ার হাদীছ অনুসন্ধানের কিতাব) نصب الراية لأحاديث الهداية হাফিয ইবনু হাজার আল আসক্বালানী কর্তৃক এরই সংক্ষেপায়িত গ্রন্থ الدراية। তাঁরই রয়েছে "রাফিঈল কাবীর" গ্রন্থের হাদীছ অনুসন্ধানের গ্রন্থ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير।

এছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে যা উল্লেখ করতে গেলে কথা দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে। আমি বলতে চাই ঃ যেহেতু ছলাতের বিস্তারিত জ্ঞান লাভ বেশীর ভাগ লোকের উপর কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাই আমি তাদের জন্য এই গ্রন্থ সংকলন করলাম যাতে করে তারা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত পদ্ধতি জানতে পারে ও ছলাতে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলতে পারে। আল্লাহর কাছে তারই আশা রাখি যার অঙ্গীকার তিনি তাঁর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যবানিতে আমাদের দিয়েছেন এই হাদীছে ঃ

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا......*

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে ডাকে তার জন্যে এর পালনকারীদের সমপরিমাণ পুণ্য রয়েছে, এতে তাদের (পালনকারীদের) পুণ্য থেকে কিছুই কমবে না। (মুসলিম ও অন্যান্য, এটা الأحاديث الصحيحة ৮৬৩ পৃষ্ঠাতেও উদ্ধৃত হয়েছে।

হাদীছের বেলায় প্রযোজ্য। আর তা এজন্য যে, দৃঢ়তা জ্ঞাপক শব্দ সম্বন্ধকৃতের পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ হওয়ার দাবী রাখে, তাই বিশুদ্ধ হাদীছ ছাড়া এ শব্দের প্রয়োগ অনুচিত। অন্যথায় মানুষ রাসূলের উপর মিথ্যারোপকারীর শামিল হবে। অথচ এই আদব রক্ষায় মুহাযযাবের লিখকসহ আমাদের (শাফিয়ীদের) ও অন্যান্য মাযহাবের অধিকাংশে ফুক্বাহাগণ ত্রুটি করেছেন। বরং ঢালাওভাবে প্রত্যেক শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এতে ত্রুটি করেছেন। কেবল হাদীছ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এথেকে বেঁচে গেছেন। এটা জঘন্য ধরনের শিথিলতা। কারণ তারা প্রায়ই ছহীহ হাদীছের ক্ষেত্রে বলে থাকে- রাসূল থেকে বর্ণিত হয়েছে, আর যঈফ হাদীছের বেলায় বলেন অমুক বর্ণনা করেছেন। এটা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়ারই নামান্তর।

গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ

আমি যেহেতু এ বিষয়ে পরিপূর্ণ কোন কিতাবের সন্ধান পাইনি, তাই আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পথ অনুসরণে আগ্রহী মুসলিম ভাইদের জন্য এমন একটি কিতাব লিখা নিজের উপর অনিবার্য মনে করলাম, যে কিতাবে তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত যথাসম্ভব নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাতের পূর্ণ বিবরণী সন্নিবেশিত হবে যাতে করে সত্যিকার অর্থে যারা নবীপ্রেমিক তাদের যে কেউ এ কিতাব খানা পেলে সহজভাবে পূর্বোক্ত হাদীছের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারে। (হাদীছটি এরূপ)

«صلوا كما رأيتموني أصلي»

অর্থ ঃ "তোমরা আমাকে যেমনভাবে ছলাত পড়তে দেখ ঠিক ঐভাবে ছলাত পড়।" এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করলাম এবং এ সম্পর্কীয় হাদীছ মন্থন করতে শুরু করলাম, হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থরাজি থেকে। সে চেষ্টারই ফসল হলো (হে পাঠক) আপনার সামনে উপস্থিত এই কিতাবটি। **আমি নিজের উপর শর্ত করে নিয়েছি যে, এতে কেবল ঐ হাদীছগুলিই সন্নিবেশিত করব যেগুলির সূত্র হাদীছ শাস্ত্রের ব্যাকরণ ও মূলনীতি অনুসারে সুসাব্যস্ত। আর যে হাদীছ সূত্রের কোন পর্যায়ে অপরিচিত অথবা দুর্বল রাবী একা পড়ে যায় সে হাদীছ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি।** চাই তা অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে হোক অথবা যিক্‌র সংক্রান্ত হোক অথবা ফযীলত বা অন্য কোন বিষয়ে হোক। যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, সুসাব্যস্ত[১] ছহীহ্ হাদীছই যঈফ হাদীছ ব্যতীত যথেষ্ট। যঈফ হাদীছ নির্বিবাদে কেবল ধারণা বা অপ্রাধান্যযোগ্য ধারণার উপকারিতা দিতে সক্ষম, আর তা আল্লাহর বাণী অনুযায়ী ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ হক থেকে মোটেও অমুখাপেক্ষী করতে পারে না।[২]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

---

[১] সুসাব্যস্ত হাদীছ বলতে মুহাদ্দিছগণের নিকট ছহীহ্ এবং হাসান হাদীছের উভয় প্রকার যথা নিজগুণে ছহীহ্ ও পরের গুণে ছহীহ্ এবং নিজগুণে হাসান ও পরের গুণে হাসান সবকে বুঝায়।

[২] সূরা আন-নাজম ২৮ আয়াত।

অর্থ ঃ তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে চল, কেননা ধারণা হচ্ছে সর্বাধিক মিথ্যা কথা।[১]

তাইতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর উপর আমল করার জন্য বাধ্য করেননি, বরং রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ٭

অর্থ ঃ তোমরা আমার থেকে কেবল যা জান তা ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনা করা থেকে বিরত থাক।[২] আর যখন তিনি যঈফ হাদীছ বর্ণনা করতে নিষেধ করলেন তখন এর উপর আমল করতে নিষেধ করবেন এটাই অতি স্বাভাবিক।

---

[১] বুখারী ও মুসলিম, এটা আমার কিতাব غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام এ উদ্ধৃত হয়েছে হাদীছ নং ৪১২।

[২] হাদীছটি ছহীহ আখ্যায়িত করেছেন তিরমিযী, আহমাদ ও ইবনু আবী শাইবাহ। শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ আল-হালাবী স্বীয় গ্রন্থ مسلسلات মুসাল সালাতে এটিকে বুখারীর দিকেও সম্পর্কিত করেছেন। যাতে তিনি প্রমাদে পতিত হয়েছেন।

পরবর্তীতে আমার নিকট পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, হাদীছটি যঈফ। (পূর্বে) ইবনু আবী শাইবাহর সানাদকে ছহীহ প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে মানাবীর অনুসরণ করেছিলাম। অতঃপর এর সম্পর্কে নিজের পক্ষেই জানা সহজ হয়ে যায় যে, এটি স্পষ্ট দুর্বল আর এটি স্বয়ং তিরমিযী ও অন্যান্যদের সনদ। দেখুন আমার কিতাব "সিলসিলাতুল আহাদীছিছ্ ছহীহাহ্" (হাদীছ নং ১৭৮৩)-এর স্থলাভিষিক্ত ছহীহ হাদীছটি এই–

من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين (رواه مسلم وغيره)

যে ব্যক্তি আমার উক্তিতে কোন হাদীছ বর্ণনা করে যার সম্পর্কে সে জানে (বা ধারণা করা হয়) যে এটি মিথ্যা সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদীদেরই একজন' এটি মুসলিম ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। দেখুন আমার কিতাব সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফাহ এর ভূমিকা (প্রথম খণ্ড)। বরং উক্ত হাদীছ থেকে প্রয়োজন মুক্ত করে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ বর্ণাটিও ঃ

« إياكم وكثرة الحديث عني، من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار » ابن أبي شيبة (٨ / ٧٦٠) وأحمد وغيرهما، و هو مخرج في الصحيحة (١٧٥٣)

তোমরা সাবধান হও! আমার থেকে বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করা থেকে। যে ব্যক্তি আমার উক্তিতে কথা বলে সে যেন ন্যায় ও সত্য ছাড়া কিছু না বলে, যে ব্যক্তি আমার উক্তিতে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি তবে সে জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করে নেয়। এটি সংকলন করেছেন ইবনু আবী শাইবাহ (৮/৭৬০) আহমাদ ও তারা দু'জন ব্যতীত অন্যান্যরা। আর এটি "আছছহীহা"তেও উদ্ধৃত হয়েছে। (১৭৫৩)

আমি এ গ্রন্থটিকে দু' ভাগে সাজিয়েছি ঃ (১) উপরিভাগ (২) নিম্নভাগ। প্রথমটা কোন কিতাবের মূল বক্তব্যের ন্যায়– তাতে হাদীছের শব্দগুলি ও কিতাবের বিশেষ প্রয়োজনীয় বাক্যগুলি সন্নিবেশিত করেছি, আর এগুলিকে তার মানানসই স্থানে প্রয়োগ করেছি, এমনভাবে তার পারস্পরিক মিল বজায় রেখেছি যে, কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ দেখা যায়। হাদীছের বাক্য ও শব্দ যেভাবে হাদীছের কিতাবে উদ্ধৃত হয়েছে তাকে সেভাবেই সযত্নে সংরক্ষণ করেছি। কখনও একাধিক শব্দ থাকলে কোন একটাকে প্রাধান্য দিয়েছি প্রণয়নের বা অন্য কোন সুবিধার্থে। আবার কখনও এর সাথে ভিন্ন শব্দকে সংযোজন করেছি। এই বলে যে, (অপর শব্দে এমনটি রয়েছে) অথবা (অপর বর্ণনায় এমনটি রয়েছে)। ছাহাবাদের যারা হাদীছগুলি বর্ণনা করেছেন তাদের যৎসামান্য ছাড়া কারো নাম উল্লেখ করিনি। এমনিভাবে হাদীছ শাস্ত্রের ইমামদের মধ্যে থেকে এর বর্ণনাকারীদের নামও। অনুসন্ধান ও তত্ত্বান্বেষণের সহজতার দিকে লক্ষ্য করে।

আর দ্বিতীয়াংশটি প্রথমটির ভাষ্যের মত। এতে উপরিভাগে উল্লিখিত হাদীছসমূহের উদ্ধৃতি দিয়েছি, হাদীছের সব ক'টি শব্দ ও সূত্র পথকে উল্লেখ করেছি, তার সূত্র এবং সহযোগী হাদীছের ব্যাপারে ভাল, মন্দ, বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য ব্যক্ত করেছি, এসব কিছু হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতির আলোকে সম্পাদিত হয়েছে। আর প্রায়ই (হাদীছের) কোন কোন সূত্রপথে এমন সব শব্দ ও বর্ধিত অতিরিক্ত কথা পাওয়া যায় বা অন্য সূত্রপথে মিলে না, এমতাবস্থায় এই শব্দ ও অতিরিক্ত কথাগুলিকে উপরিভাগের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখা সম্ভব হলে তা জুড়িয়ে দিয়েছি।

এবং লম্বালম্বি দু'টো ব্র্যাকেটের মাঝে স্থাপন করে এ কাজের প্রতি ইঙ্গিত করেছি এভাবে তাতে মূল হাদীছের একক সংকলকের নাম উল্লেখ করিনি। আর এটা ঐ অবস্থার কথা যখন হাদীছের বর্ণনার উৎস শুধু একজন ছাহাবী। অন্যথায় এটাকে স্বতন্ত্র আরেক প্রকার হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করেছি যেমনটি আপনি ছলাতের শুরুতে পঠিতব্য দু'আগুলির ব্যাপারে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখতে পাবেন। এটা একটা কঠিন ও উত্তম কাজ যা এমনভাবে অন্য কিতাবে আপনি পাবেন না। তাই ঐ আল্লাহর জন্যে সব প্রশংসা যাঁর অনুগ্রহে পুণ্যকর্মসমূহ সম্পাদিত হয়।

তারপর আমাদের সংকলিত হাদীছ সম্পর্কে উলামাদের মতামত এবং তাদের দলীল উল্লেখ পূর্বক তার পর্যালোচনা ও পক্ষ বিপক্ষমূলক আলোচনা

করব। অতঃপর এই প্রক্রিয়ায় উপরে উল্লেখকৃত সঠিক কথা উদ্ধার করবো। কখনও এমন কিছু মাসআলার অবতারণা করবো যে ব্যাপারে স্পষ্ট কোন হাদীছ নাই, বরং তা কেবল গবেষণালব্ধ মাসআলা যা আমার এই কিতাবের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিতাবটির নামকরণ করলাম ঃ "নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি, তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত যেন আপনি তা দেখছেন"। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন একে তার সম্মানিত চেহারার জন্য নিরংকুশভাবে মনোনীত করেন এবং এর মাধ্যমে আমার মু'মিন ভাইদেরকে উপকৃত করেন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা (প্রার্থনা) মঞ্জুরকারী।

কিতাবটির সংকলন পদ্ধতি

কিতাবটির বিষয় যেহেতু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত সংক্রান্ত নির্দেশনার বর্ণনা দান, তাই স্বভাবতই আমি পূর্বোল্লিখিত কারণে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুকরণ করবো না। বরং এতে কেবল ঐ হাদীছগুলিই উদ্ধৃত করব যা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত। যেমনটি অতীত ও বর্তমানের।[১] মুহাদ্দিছীনের[২] অনুসৃত পথ।

---

[১] ইমাম সুবকী "ফাতাওয়া" ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ অতঃপর মুসলিমদের প্রধান বিষয় হচ্ছে ছলাত, প্রতিটি মুসলিমের পক্ষে এর উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত এবং নিয়মিত তা পালন করা প্রয়োজন। তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো (ফরয রুকনগুলো) প্রতিষ্ঠিত করা। তাতে কিছু কাজ এমন রয়েছে যা সর্বসম্মতিক্রমে পালনীয় তা থেকে বিরত থাকার কোন উপায় নেই। আর কিছু কাজ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, এক্ষেত্রে সঠিক পথ হচ্ছে দু'টি যথা ঃ (১) যদি সম্ভব হয় তবে মতভেদ এড়াতে চেষ্টা করবে, অথবা (২) নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছে যা এসেছে তা আঁকড়ে ধরবে। যখন এ কাজ করবে তখন তার ছলাত বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত হয়ে উঠবে এবং আল্লাহর এ বাণীর আওতাভুক্ত হবে ঃ

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ﴾

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন নেক আমল করে আর স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে অংশিদার না করে।" (সূরা কাহফ ঃ ১১০)

আমি বলছি ঃ দ্বিতীয় পন্থাটাই ভাল বরং অপরিহার্য, কেননা প্রথম পন্থাটি অনেক বিষয়ে তার বাস্তবতা অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তাতে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই নির্দেশটি প্রতিফলিত হয় না। صلوا كما رأيتموني أصلي অর্থ ঃ "তোমরা আমাকে যেভাবে ছলাত পড়তে দেখ ঠিক ঐভাবে ছলাত পড়", কেননা এমতাবস্থায় তার ছলাতে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাতের বিপরীত হওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অতএব বিষয়টি অনুধাবন করুন।

[২] আবুল হাসনাত লাক্ষ্ণৌভী إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام কিতাবের ১৫৬ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইনছাফের দৃষ্টিতে চিন্তা করবে এবং কোন রূপ গোড়ামি ব্যতিরেকে ফিক্হ ও মূলনীতির সাগরে ডুব দিবে সে সুনিশ্চিতভাবে একথা জানতে পারবে যে, আলিমগণের মতভেদকৃত বেশীরভাগ মৌলিক ও অমৌলিক মাসআলায় অন্যদের তুলনায় মুহাদ্দিছগণের মাযহাবই শক্তিশালী। আমি যখন বিতর্কিত বিষয়ের শাখা প্রশাখায় ঘুরে বেড়াই তখন মুহাদ্দিছদের মাযহাবকে অন্যদের মাযহাব অপেক্ষা অধিকতর ইনছাফভিত্তিক পাই। আল্লাহ তা'আলা কতইনা ভাল করেছেন এবং এর উপরে তাদের কতনা শুকরিয়া-(প্রধান বক্তব্যে একথা এভাবেই এসেছে) আর কেনইবা এমন হবে না? তারা যে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী এবং তাঁর শরীয়তের সত্যিকার প্রতিনিধি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের দলভুক্ত করে হাশর করুন এবং তাদের ভালবাসা ও চরিত্রের উপর রেখে মৃত্যু দান করুন।

নিঃসন্দেহে সুন্দর বলেছেন যে ব্যক্তি (নিম্নোক্ত) কথাটি বলেছেন ঃ

أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا ۞

অর্থ ঃ আহলুল হাদীছগণ নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আপনজন, তারা যদিও তাঁর সংস্রব পায়নি তবে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের সংস্রব পেয়েছে।[১] অর্থাৎ তারা তাঁর বাণীর সাথী হয়েছে, যে দিকে তাঁর বানী নির্দেশ করে তারা সে দিকে যায়।

আর এজন্যই মাযহাবগত তারতম্য থাকা সত্ত্বেও কিতাবটি হাদীছ ও ফিক্বহ-এর কিতাবাদিতে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলোর সম্মিলন সাধন করবে ইনশাআল্লাহ। বলতে কি এই কিতাবে যে পরিমাণ হক্ব কথার সমাহার ঘটেছে অন্য কোন কিতাব বা মাযহাবে ঘটেনি।

আর এই কিতাব অনুযায়ী আমলকারী ইনশাআল্লাহ ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন ঃ

لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞

স্বীয় ইচ্ছায় সেই সত্যের জন্যে যাতে তারা মতভেদ করেছে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।[২]

আমি যখন নিজের জন্য এই নীতি নির্ধারণ করি যে, শুধু বিশুদ্ধ হাদীছ অবলম্বন করব এবং বাস্তবেও এই কিতাবসহ অন্য কিতাবাদিতে এই নীতি অবলম্বন করেছি। যেগুলো অচিরেই মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করবে ইনশাআল্লাহ তা'আলা। তখন থেকেই আমি একথা জানতাম যে, আমার এই কাজ সব দল ও মাযহাব (এর লোক)-কে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। বরং অচিরেই তাদের কেউ কেউ বা অনেকেই আমার প্রতি আঘাতমূলক কণ্ঠ ও দোষারোপের কলম ছুড়ে মারবে। তবে এতে আমার অসুবিধা নেই। কেননা আমি এটাও জানি যে, সকল মানুষের সন্তুষ্টি লাভ দুর্লভ ব্যাপার। আর নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ۞

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মানুষকে সন্তুষ্ট করে

---

[১] হাফিয যিয়াউদ্দীন আল-মাক্বদিসী তার فضل الحديث وأهله কিতাবে উল্লেখ করেন যে, এর রচয়িতা হচ্ছেন কবি হাসান বিন মুহাম্মাদ আল নাসাবী।

[২] সূরা আল-বাক্বারা ২১৩ আয়াত।

আল্লাহ্ তাকে মানুষের দায়িত্বে অর্পণ করেন।[১]

আল্লাহ! কবি কত সুন্দর না বলেছেন ঃ

ولست بناج من مقالة طاعن

ولو كنت فى غارعلى جبل وعر *

ومن ذا الذى ينجومن الناس سالما

ولوغاب عنهم بين خافيتي نسر *

তুমি দোষারোপকারীর কথার গ্লানি থেকে নিষ্কৃতি পাবেই না,
যদিও বা দুর্গম পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেও।

আর কে আছে মানবের দোষারোপ থেকে মুক্তি পাওয়ার মত
যদিও বা শকুনের ডানার তলে আড়াল হয় না কেন।

আমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এই (অনুসৃত) পথটাই হচ্ছে সর্বাধিক সঠিক পথ যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর মুমিন বান্দাহগণকে আদেশ প্রদান করেছেন এবং রাসূলগণের প্রধান আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এটাই সেই পথ যার অনুসরণ করেছেন ছাহাবা, তাবিঈন ও তৎপরবর্তী সৎ পূর্বসুরীগণ, যাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম চতুষ্টয় যাদের নামে সৃষ্ট মাযহাবসমূহের সাথে আজকের জগতের বেশীরভাগ মুসলিম সম্পর্কযুক্ত। তাঁদের প্রত্যেকেই সুন্নাহ্ (হাদীছ) আঁকড়ে ধরা ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অপরিহার্যতার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং তার বিপরীত যে কোন কথাকে পরিত্যাগ করতেও একমত ছিলেন– সে কথার প্রবক্তা যত বড়ই হোন না কেন, যেহেতু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদা হচ্ছে তাদের তুলনায় অনেক বেশী এবং তাঁর পথ সর্বাধিক সঠিক। তাই আমি তাঁদের পথ ধরে চলেছি, আর তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি এবং হাদীছ আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে তাদেরই নির্দেশসমূহ মেনে চলি। যদিও হাদীছটি তাদের কথার বিপরীতও হয়। তাদের এহেন নির্দেশনাবলীই সোজা পথে চলা ও অন্ধ অনুসরণ থেকে বিমুখ হওয়ার ব্যাপারে আমার উপর বিরাট প্রভাব ফেলেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

---

[১] তিরমিযী, কুযা'ঈ, ইবনু বিশরান ও অপরাপরগণ (বর্ণনা করেছেন)। উক্ত হাদীছ ও তার সূত্রগুলোর উপর شرح العقيدة الطحاوية কিতাবের হাদীছ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আলোকপাত করেছি। অতঃপর سلسلة الأحاديث الصحيحة ২৩১১ নম্বরেও আলোচনা করেছি এবং বলেছি যে, একে যারা ছাহাবী পর্যন্ত ঠেকিয়েছেন (মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন) এর ফলে তার কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। আর একে ইবনু হিব্বান ছহীহ বলেছেন।

সুন্নাহ্‌র অনুসরণ ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা বর্জন করার ব্যাপারে ইমামগণের উক্তি

এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমামগণের পক্ষ থেকে যে সব উক্তি আমি সংগ্রহ করেছি তার কিছুটা উল্লেখ করা উপকারী বলে মনে করছি। হয়তোবা যারা তাঁদের বরং তাঁদের চেয়ে অনেক নিম্নপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের অন্ধ অনুকরণ করে; তাদের জন্য এতে উপদেশ থাকতে পারে।[১] তারা তাদের মাযহাব এবং কথাগুলোকে আসমান থেকে অবতীর্ণ ঐশী বাণীর ন্যায় শক্ত হাতে ধরে রাখে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ কর, এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ওলীর অনুসরণ কর না। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।[২]

১। আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমামগণের মধ্যে প্রথমেই হলেন ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন ছাবিত (রাহিমাহুল্লাহ)। তাঁর সাথীগণ তাঁর অনেক কথা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সব কয়টি কথা একটাই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে, আর তা হচ্ছে ঃ হাদীছকে আঁকড়ে ধরা ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা পরিহার করা ওয়াজিব। (কথাগুলো হচ্ছে)

(১) إذا صح الحديث فهو مذهبي অর্থ ঃ হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে।[৩]

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ﴿

---

[১] এই অন্ধ অনুসরণকে উদ্দেশ্য করেই ইমাম ত্বাহাবী বলেছেন ঃ لا يقلد إلا عصبي أو غبي গোঁড়া অথবা নির্বোধ ছাড়া অন্য কেউ অন্ধ অনুসরণ (তাক্বলীদ) করে না। ইবনু আবিদীন একথা তাঁর পুস্তিকাগুচ্ছের رسم المفتي গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ১ম খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা।

[২] সূরা আ'রাফ ৩ আয়াত।

[৩] ইবনু আবিদীন এর হাশিয়া ১ম খণ্ড ৬৩ পৃষ্ঠা, رسم المفتي ১ম খণ্ড ৪র্থ পৃষ্ঠা, ছালিহ আল ফাল্লানীর إيقاظ الهمم পৃষ্ঠা ৬২ ইত্যাদি। ইবনু আবিদীন ইবনুল হুমামের উস্তায ইবনুশ শাহনা আল-কাবীরের شرح الهداية থেকে উদ্ধৃত করেন ঃ

إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه.

لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه (২)

আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারো জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়।[১]

অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

« حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي »

অর্থ ঃ যে আমার কথার প্রমাণ জানে না তার পক্ষে আমার কথার দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করা হারাম। (টীকায় উল্লেখকৃত দ্বিতীয় বর্ণনাটি)

অন্য বর্ণনায় আরো বাড়িয়ে বলেছেন ঃ

"فإننا بشر، نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا"

অর্থ ঃ কেননা আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আবার আগামীকাল তা থেকে ফিরে যাই। (টীকায় উল্লেখকৃত তৃতীয় বর্ণনাটি)

ولايخرج مقلد عن كونه حنفيا بالعمل به فقدصح عن أبي حنيفة أنه قال : «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقدحكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة»

অর্থ ঃ যখন হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে আর তা মাযহাবের বিপক্ষে থাকবে তখন হাদীছের উপরেই আমল করা উচিত হবে এবং এটাই তাঁর (ইমামের) মাযহাব বলে বিবেচিত হবে। উক্ত হাদীছের উপর আমল করাটা তাকে হানাফী মাযহাব থেকে বহিষ্কার করবে না। কেননা বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা থেকে এসেছে যে, হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এটাই আমার অনুসৃত পথ বলে জানতে হবে। একথা ইমাম ইবনু আব্দিল বার ইমাম আবূ হানীফাসহ অন্যান্য ইমামদের থেকেও বর্ণনা করেন।

আমি বলছি ঃ এটা হচ্ছে ইমামগণের ইল্‌ম ও তাক্বওয়ার পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ। যাতে তারা একথারই ইঙ্গিত প্রদান করছেন যে, তাঁরা সমস্ত হাদীছ আয়ত্ব করতে পারেননি। যে কথা ইমাম শাফিয়ী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, পরবর্তীতে যার উল্লেখ রয়েছে। তাই কদাচ তাদের নিকট অনাগত অজানা সুন্নাতের বিপরীত কিছু (বচন-আচরণ) পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই তাঁরা আমাদেরকে সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরার এবং এটাকেই তাদের অবলম্বিত পথ (মাযহাব) হিসাবে গণ্য করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সবাইকে রহম করুন।

(১) ইবনু আব্দিল বর এর الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء পৃষ্ঠা ১৪৫ ইবনুল কাইয়িম এর إعلام الموقعين (২/৩০৯), ইবনুল আবিদীন البحر الرائق এর টীকায় (৬/২৯৩), رسم المفتي পৃষ্ঠা ২৯, ৩২, শা'রানীর الميزان এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি রয়েছে (১/৫৫) আর তৃতীয় বর্ণনা পাওয়া যাবে আব্বাছ আদ্দূরীর বর্ণনায় ইবনু মা'ঈন এর التاريخ গ্রন্থে (৬/৭৭/১) যুফার থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে। এ ধরনের বর্ণনা ইমাম সাহেবের সাথী যুফার, আবূ ইউসুফ এবং আফিয়া ইবনু ইয়াযীদ থেকেও এসেছে الإيقاظ ==

অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

« ويحك يا يعقوب (هو أبو يوسف) لاتكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد »

অর্থ ঃ এই হতভাগা ইয়াকুব! (আবূ ইউসুফ) তুমি আমার থেকে যাই শুন তা লিখনা, কেননা আমি আজ এক মত পোষণ করি এবং আগামীকাল তা পরিহার করি, আবার আগামীকাল এক মত পোষণ করি আর পরশুদিন তা পরিত্যাগ করি।[১] (আল ঈক্বায গ্রন্থের ৬৫ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)

পৃষ্ঠা ৫২, ইবনুল কাইয়িম আবূ ইউসুফ থেকে একথার বিশুদ্ধতার কথা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। অতিরিক্ত কথাটি যা আবূ ইউসুফকে সম্বোধন করে বলেছেন الايقاظ এর ৬৫ পৃষ্ঠার টীকায় ইবনু আব্দিল বার ও ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্যদের থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

আমি বলছি ঃ যদি তাদের কথা এমন হয় এ সব লোকদের ব্যাপারে যারা তাদের কথার দলীল কি সেটা জানে নাই তবে ঐসব লোকদের ব্যাপারে তাদের কি বক্তব্য হতে পারে যারা তাদের (ইমামদের) কথার বিপক্ষে দলীল রয়েছে তা জানার পরেও দলীলের বিপরীত ফাতওয়া দেয়। অতএব হে পাঠক! বাক্যটি নিয়ে আপনি ভেবে দেখুন, কেননা এ একটি বাক্যই তাকলীদের (অন্ধ অনুসরণের) প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। তাইতো কোন এক মুকাল্লিদ আলিমকে দলীল না জেনে ইমাম আবূ হানীফার কথায় ফতওয়া দানে আমি বাধা প্রদান করলে তিনি এটাকে ইমাম সাহেবের কথা বলে অস্বীকার করেন।

[১] আমি বলছি ঃ এর কারণ এই যে, ইমাম সাহেব প্রায়ই কিয়াস করে কথা বলতেন, তাই পরবর্তীতে যখন অপর একটি আরো শক্তিশালী কিয়াস প্রকাশ পেয়ে যেত অথবা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছ তাঁর কাছে পৌঁছে যেত তখন তিনি এটাই গ্রহণ করতেন আর তার পূর্বের কথা পরিহার করতেন। শা'রানী الميزان গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠায় বলেন যার সংক্ষেপ হচ্ছে এই ঃ

« واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة، وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور، وظفر بها، لأخذ بها وترك كل قياس كان قاسه، وكان القياس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه، لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور، كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة، لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها، بخلاف غيره من الأئمة، فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى، ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه، وقلته في مذاهب غيره »

অর্থ ঃ আমরা এবং প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখি যে, যদি তিনি শরীয়ত (হাদীছ) লিপিবদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বেঁচে

৩। إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي ‹

থাকতেন আর হাফিযগণ তা একত্রিত করার জন্য বিভিন্ন দেশ ও সীমান্তে ভ্রমণ করে তা অর্জন করে ফেলতেন এবং তিনি তা হস্তগত করতে পারতেন তাহলে ইমাম সাহেব এগুলোই গ্রহণ করতেন আর যতসব কিয়াস করেছিলেন তা পরিহার করতেন। ফলে তাঁর মাযহাবেও অন্যান্য মাযহাবের ন্যায় কিয়াস কমে আসত। কিন্তু শরীয়তের দলীল যেহেতু তাঁর যুগে তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈনদের কাছে বিভিন্ন শহর, গ্রাম ও সীমান্তে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল তাই তার মাযহাবে আবশ্যিকভাবে অন্যান্য ইমামদের চেয়ে বেশী কিয়াসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তা এই জন্য যে, তিনি তার কিয়াসকৃত মাসআলাগুলোতে স্পষ্ট দলীল পাননি। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ তার চেয়ে ব্যতিক্রম। কেননা হাদীছ শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তাঁদের যুগে হাদীছ অন্বেষণ ও সংকলনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছিলেন, তাতে শরীয়তের এক হাদীছ অপর হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। এটাই ছিল তাঁর মাযহাবে কিয়াস বেশী ও অন্যান্যদের মাযহাবে তা কম হওয়ার (মূল) কারণ।

আবুল হাসানাত লক্ষ্ণৌভী النافع الكبير গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় এতদ সংক্রান্ত বিষয়ের এক বৃহৎ অংশ উদ্ধৃত করেন এবং তার উপর সমর্থনমূলক এবং ব্যাখ্যাদানমূলক টীকা সংযুক্ত করেন। উৎসুক মহল তা পড়ে দেখতে পারেন।

আমি বলছি ঃ আবূ হানীফা (রহঃ) কর্তৃক অনিচ্ছাকৃতভাবে বিশুদ্ধ হাদীছ বিরোধী কথার পক্ষে যখন এহেন 'উযর বিদ্যমান, যা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। কেননা আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তাঁর সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপান না। অতএব তাকে কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোক যেভাবে কটাক্ষ করে কথা বলে তা মোটেও বৈধ নয়। বরং তাঁর ব্যাপারে আদব রক্ষা করা ওয়াজিব। কেননা তিনি মুসলিম সমাজের ইমামগণের একজন যাদের দ্বারা এই দীনকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে অযৌক্তিক মাসআলার ক্ষেত্রে অনেক কিছু পৌঁছেছে। তিনি ভুল শুদ্ধ যা কিছু বলেছেন সর্বাবস্থায়ই প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন। অপরপক্ষে তাঁর ভক্তদেরও উচিত হবে না যে, তারা তাঁর হাদীছ বিরোধী কথাগুলো ধরে থাকবে। কেননা এটা তাঁর মাযহাব নয়। যেমন আপনি এ ব্যাপারে তাঁর কথাগুলো কিছুক্ষণ পূর্বে দেখলেন, তাই বলি (উপরোক্ত লোকদের) একদল হচ্ছে এক প্রান্তে আর অপর দল হচ্ছে অন্য প্রান্তে। অথচ হক্ব বিরাজ করছে উভয় দলের মাঝামাঝিতে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং ঈমান আনয়নে আমাদের অগ্রণী ভাইদেরকে ক্ষমা কর। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি অতি মমতাময় দয়ালু। (সূরা আল-হাশর ১০ আয়াত)

অর্থ ঃ যখন আমি এমন কথা বলি যা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব ও রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছ বিরোধী তা হলে তোমরা আমার কথা পরিত্যাগ করবে।[১]

২। মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ

(১) «إنما أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل مالم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»

অর্থ ঃ আমি নিছক একজন মানুষ। ভুলও করি শুদ্ধও বলি। তাই তোমরা লক্ষ্য করো আমার অভিমতের প্রতি। এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে তা গ্রহণ কর আর যতটুকু এতদুভয়ের সাথে গর্মিল হয় তা পরিত্যাগ কর।[২]

(২) «وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله

---

[১] ফাল্লানীর الإيقاظ গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠায় তিনি এটাকে ইমাম মুহাম্মদের কথা বলেও উল্লেখ করেন। অতঃপর বলেন ঃ এ কথা এবং এ মর্মের অন্যাসব বক্তব্য মুজতাহিদের জন্যে নয় কেননা তিনি ইমামদের কথার প্রয়োজন বোধ করেন না বরং এটি (ইমামের কথাকে দলীলের সঙ্গে মিলিয়ে মানা) মুকাল্লিদ-এর জন্যই প্রযোজ্য।

আমি বলছি ঃ এর উপরেই ভিত্তি করে ইমাম শা'রানী الميزان গ্রন্থের ১ম খণ্ড ২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ তুমি যদি বল, তবে সেই হাদীছকে আমি কী করব যা আমার ইমামের মারা যাওয়ার পর বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে এবং তিনি তা গ্রহণ করেননি। উত্তর হবে এই যে, তোমার পক্ষে ওয়াজিব হবে হাদীছের উপর আমল করা। কারণ তোমার ইমাম যদি এটি পেতেন এবং তা তাঁর কাছে বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে যেত তবে হয়তোবা তিনি এটাই মেনে নেয়ার জন্য তোমাকে নির্দেশ দিতেন। কারণ ইমামগণের প্রত্যেকেই শরীয়তের হাতে বন্দী। যে ব্যক্তি তা মেনে নিল সে দুই হাতে সমস্ত মঙ্গল অর্জন করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি বলল ঃ আমার ইমাম যে হাদীছ গ্রহণ করেছেন কেবল সেই হাদীছের উপরেই আমি আমল করব সে ব্যক্তি থেকে অনেক মঙ্গল ছাড়া পড়বে যেমনটি হচ্ছে অনেক মাযহাবের ইমামদের অন্ধ অনুসারীদের বেলায়। তাদের পক্ষে উত্তম ছিল ইমামগণের অছিয়ত অনুযায়ী তাঁদের পরে যে সব হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তার উপর আমল করা। কেননা আমাদের বিশ্বাস যে, তাঁরা যদি বেঁচে থাকতেন এবং তাদের ইন্তিকালের পরে যেসব হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তা পেয়ে যেতেন তবে অবশ্যই তা গ্রহণ করতেন এবং তার উপরে আমল করতেন। আর যতসব কিয়াস ও কথা তাদের পক্ষ থেকে এসেছে তা পরিহার করতেন।

[২] ইবনু আব্দিল বর الجامع الصغير গ্রন্থে (২/৩২) তাঁর থেকে ইবনু হাযম أصول الأحكام গ্রন্থে (৬/১৪৯) ফাল্লানী ৭২ পৃঃ।

ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم »

অর্থ ঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের কথা গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় (কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল কথা গ্রহণীয়)।[১]

(৩) ইবনু অহাব বলেন ঃ আমি মালিক (রাহঃ)-কে 'ওযূ' তে পদ যুগলের অঙ্গুলিসমূহ খিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি তিনি (উত্তরে) বলেন ঃ লোকদেরকে তা করতে হবে না। (ইবনু অহাব) বলেন ঃ আমি তাঁকে লোকসংখ্যা কমে আসা পর্যন্ত ছেড়ে রাখলাম। অতঃপর বললাম, আমাদের কাছে এ বিষয়ে হাদীছ রয়েছে, তিনি বললেন, সেটা কী? আমি বললাম ঃ আমাদেরকে লাইছ ইবনু ছা'য়াদ, ইবনু লহী'য়াহ ও আমর ইবনুল হারিছ ইয়াযীদ ইবনু আমর আল মু'য়াফিরী থেকে তিনি আবু আব্দির রহমান আল হুবালী থেকে তিনি আল মুসতাউরিদ বিন শাদ্দাদ আল কুরাশী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

« رأيت رسول الله ﷺ يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه »

অর্থ ঃ আমি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা পদযুগলের অঙ্গুলিগুলোর মধ্যভাগ মর্দন করেছেন। এতদশ্রবণে ইমাম মালিক বললেন, এ-তো সুন্দর হাদীছ। আমি এ যাবৎ এটি শুনিনি। পরবর্তীতে তাঁকে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি তাতে তিনি অঙ্গুলি মর্দনের আদেশ দিতেন।[২]

---

[১] এটি ইমাম মালিকের কথা হিসেবে পরবর্তীদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর থেকে বর্ণিত হওয়ার বিশুদ্ধতা ইবনু আব্দিল হাদী সাব্যস্ত করেছেন, إرشاد السالك (১/২২৭)। ইবনু আব্দিল বর ঘটনাটি الجامع এর (২/৯১) পৃষ্ঠায় এবং ইবনু হাযম أصول الأحكام এর (৬/১৪৫, ১৭৯) পৃষ্ঠায় হাকাম ইবনু উতাইবাহ ও মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাক্বীউদ্দীন আস্ সুবকী الفتاوى এর (১/১৪৮) পৃষ্ঠায় ইবনু আব্বাসের কথা হিসাবে উদ্ধৃত করেন যার সৌন্দর্যে তিনি বিমোহিত হন। অতঃপর বলেন, কথাটি (মূলতঃ) ইবনু আব্বাসের কাছ থেকে মুজাহিদ গ্রহণ করেন, আর তাদের দু'জনের কাছ থেকে ইমাম মালিক তা গ্রহণ করেন এবং তার কথা বলে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে।

আমি বলছি ঃ অতঃপর তাঁদের কাছ থেকে ইমাম আহমাদ এটি গ্রহণ করেন, তাই আবু দাউদ مسائل الإمام أحمد গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আমি আহমদকে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন ঃ এমন কোন লোক নাই যার সব কথাই গ্রহণযোগ্য কেবল নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত।

[২] ইবনু আবী হাতিম এর الجرح والتعديل গ্রন্থের ভূমিকা (৩১-৩২ পৃঃ)। বাইহাকী এটিকে পূর্ণরূপে السنن গ্রন্থের (১/৮১)-তে বর্ণনা করেছেন।

৩। শাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম শাফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে এ মর্মে অনেক চমৎকার চমৎকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে।[১] তাঁর অনুসারীগণ তাঁর এ সব কথায় অধিক সাড়া দিয়েছেন এবং উপকৃতও হয়েছেন। কথাগুলোর মধ্যে রয়েছে।

«مامن أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله ﷺ وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي»

(১) প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিছু সুন্নাহ গোপন থাকবেই ও ছাড়া পড়বেই। তাই আমি যত কথাই বলেছি অথবা মৌলনীতি উদ্ভাবন করেছি সেক্ষেত্রে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য পাওয়া গেলে আল্লাহর রাসূলের কথাই হচ্ছে চূড়ান্ত আর এটিই হবে আমার (বরণীয়) কথা।[২]

«أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله ﷺ، لم يحل له أن يدعها لقول أحد»

(২) মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যার কাছে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ্‌ (হাদীছ) পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হয়ে যায় তার পক্ষে বৈধ নয় অন্য কারো কথায় তা বর্জন করা।[৩]

---

[১] ইবনু হাযম বলেন ঃ (৬/১১৮) যে সব ফক্বীহদের অন্ধ অনুসরণ করা হয় তারা নিজেরাই তাক্বলীদ খণ্ডন করেছেন, তারা স্বীয় সাথীদেরকে নিজেদের তাক্বলীদ থেকে নিষেধাজ্ঞা শুনিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ ছিলেন কঠিনতম। ছহীহ হাদীছ অনুসরণ ও দলীল যা অপরিহার্য করে তা গ্রহণের গুরুত্ব তাঁর কাছে যত বেশী ছিল তা অন্যদের কাছে ছিল না। তাঁকে অন্ধ অনুসরণ করার প্রতিও তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি তা ঘোষণাও করেছেন। আল্লাহ্‌ তাঁর মাধ্যমে উপকার করুন এবং তাঁকে বড় ধরনের প্রতিদান দান করুন। তিনি বহু মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসার সোপান ছিলেন।

[২] হাকিম স্বীয় অবিচ্ছিন্ন সূত্রে শাফি'ঈ থেকে বর্ণনা করেন যেমন রয়েছে ইবনু আসাকির এর تاريخ دمشق গ্রন্থের (১৫/১/৩ পৃঃ) إعلام الموقعين গ্রন্থে (২/৩৬৩,৩৬৪ পৃঃ) ও الإيقاظ গ্রন্থে (১০০ পৃঃ)।

[৩] ইবনুল কাইয়িম (২/৩৬১), আল ফাল্লানী (৬৮ পৃঃ)।

«إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ﷺ، فقولوا بسنة رسول الله ﷺ، ودعوا ماقلت» (وفي رواية : فاتبعوها، ولا تلتفتوا إلى قول أحد)

(৩) তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ্ বিরোধী কিছু পাবে তখন আল্লাহর রাসূলের সুন্নাতানুসারে কথা বলবে, আর আমি যা বলেছি তা ছেড়ে দিবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ তোমরা তারই (সুন্নাতেরই) অনুসরণ কর, আর অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না।[১]

(৪) إذا صح الحديث فهو مذهبي

অর্থ ঃ হাদীছ বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে গেলে এটাই আমার গৃহীত পন্থা (মাযহাব)।[২]

---

[১] আল হারাবীর ذم الكلام গ্রন্থে (৩/৪৭/১), খত্বীবের الاحتجاج بالشافعي গ্রন্থে (৮/২), ইবনু আসাকির (১৫/৯/১), নববীর المجموع গ্রন্থে (১/৬৩), ইবনুল কাইয়িম (২/৩৬৮), আল ফাল্লানী (১০০ পৃঃ)। অপর বর্ণনাটি আবূ নুআইমের الحلية গ্রন্থে (৯/১০৭), ইবনু হিব্বানের الصحيح গ্রন্থে (৩/২৮৪-ইহসান) স্বীয় বিশুদ্ধ সনদে ইমাম থেকে তার (আবু নুআইমের) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

[২] নববীর পূর্বোক্ত কিতাবে, শা'রানী তার গ্রন্থে (১/৫৭ পৃঃ) এটাকে হাকিম বাইহাক্বীর কথা বলে উল্লেখ করেন। আল ফাল্লানী (১০৭ পৃঃ)।

ইমাম শা'রানীর বলেন ঃ ইবনু হযম বলেন ঃ (বাক্যটির অর্থ) তাঁর নিকট অথবা অন্য কোন ইমামের নিকট (হাদীছটি) বিশুদ্ধ হয়ে গেলে (সেটাই আমার মাযহাব)।

আমি বলছি ঃ ইমাম সাহেবের সমাগত বাণী সংশ্লিষ্ট কথার পরে স্পষ্টতঃ এই (ইবনু হযমের ব্যাখ্যারই) অর্থই বহন করে।

ইমাম নববীর বক্তব্যের সংক্ষেপ হচ্ছে ঃ এই কথার উপর আমাদের সাথীগণ আমল করেছেন ফজরের আযানে الصلاة خير من النوم বলে ছলাতের জন্য মানুষকে জাগ্রত হওয়ার আহ্বান করার বিষয়ে (যার তিনি বিরোধী ছিলেন) এবং ইহরামের অবস্থা থেকে রোগের উযর সাপেক্ষে হালাল হওয়ার শর্তের ব্যাপারে (যে শর্ত তিনি করেছিলেন, অথচ রোগ ছাড়া অন্য কারণেও ইহরাম মুক্ত হওয়ার সপক্ষে হাদীছ এসেছে)। এতদুভয় বিষয় ছাড়াও আরো যা (তার) মাযহাবের কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমাদের সাথীদের মধ্যে যারা (ইমামের ফাতওয়ার বিপক্ষে) হাদীছ দ্বারা ফাতওয়া দিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে তারা হচ্ছেন ঃ আবু ইয়া'কুব আল বুওয়াইত্বী, আবুল কাসিম আদ্দারিকী, আর যারা (ইমাম সাহেবের এই বাণীকে) আমল দিয়েছেন আমাদের মুহাদ্দিছ সাথীদের মধ্য হতে তারা হচ্ছেন ঃ ইমাম আবু বকর আল বাইহাক্বী ও অন্যান্যগণ। আমাদের পূর্ববর্তীদের একদল এমন ছিলেন যারা কোন বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর মাযহাবের বিপরীতে হাদীছ পেলে তাঁরা হাদীছের উপরেই আমল করতেন এবং এ দিয়েই ফাতওয়া প্রদান করতেন আর বলতেন ঃ হাদীছের সাথে যা মিলে তাই ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব।==

«أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح، فأعلموني به أي شيء يكون: كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا»

(৫) আপনারাই[১] হাদীছ বিষয়ে ও তার রিজালের (বর্ণনাকারীদের)

শাইখ আবু আমর বলেন ঃ শাফি'ঈদের মধ্যে যিনি এমন হাদীছ পান যা স্বীয় মাযহাবের বিরোধিতা করে তখন তিনি ভেবে দেখেন, যদি তাঁর মধ্যে ব্যাপক ইজতিহাদের উপকরণগুলো পরিপূর্ণ থাকে অথবা শুধু এই অধ্যায় বা বিষয়ে তা পাওয়া যায় তবে হাদীছের উপর আমল করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা রয়েছে। আর যদি তার মধ্যে ইজতিহাদের উপায়-উপকরণগুলো না পাওয়া যায়, আর হাদীছ বিরোধী কাজ তাঁর পক্ষে কঠিন মনে হয় অথচ খুঁজাখুঁজি করে হাদীছের বিপরীত বক্তব্য পোষণকারীর পক্ষে কোন সমুচিত জওয়াব না পাওয়া যায় তবে ইমাম শাফি'ঈ ছাড়া অন্য কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমাম যদি এর উপর আমল করে থাকেন তবে তার এটির উপর আমল করার অধিকার রয়েছে। আর এক্ষেত্রে এ নীতি অবলম্বন ইমামের মাযহাব পরিত্যাগের ব্যাপারে 'উযর বলে বিবেচিত হবে। তাঁর এ কথা সুন্দর ও পালনীয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞাত।

আমি বলছি ঃ এখানে অপর একটি পরিস্থিতি থেকে গেছে যা ইবনুছ ছালাহ (আবু আমর) উল্লেখ করেননি তা হচ্ছে যখন হাদীছের উপর আমলকারী কাউকে না পাওয়া যায় তখন কী করবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তক্বীউদ্দীন সুবকী। তাঁর معنى قول الشافعي ... إذا صح الحديث ... নামক গ্রন্থে (৩/১০২ পৃঃ) তিনি বলেন ঃ আমার নিকট হাদীছ অনুসরণ করাই উত্তম। কেউ ধরে নিক যে, সে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে রয়েছে এবং তাঁর কাছ থেকেই হাদীছ শুনল, তবে কি হাদীছ মান্য করতে দেরী করার কোন অবকাশ থাকবে? আল্লাহের শপথ, থাকবে না। আর প্রত্যেকেই তার বুঝ অনুযায়ী (হাদীছের প্রতি) আমল করতে বাধ্য। উক্ত আলোচনা ও তথ্যের পূর্ণ বিবরণ পাবেন إعلام الموقعين (২/৩০২ ও ৩৭০) এবং ফুল্লানীর কিতাব যার নাম ঃ

«إيقاظ همم أولي الأبصار، للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار، من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار»

কিতাবটি স্বীয় অধ্যায়ে অতুলনীয়। প্রত্যেক সত্য প্রিয় ব্যক্তির কর্তব্য অনুধাবন ও গবেষণামূলক মানসিকতা নিয়ে এটি পাঠ করা।

[১] সম্বোধনটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে করেছেন, কথাটি ইবনু আবি হাতিম آداب الشافعي গ্রন্থের ৯৪-৯৫ পৃষ্ঠাতে বর্ণনা করেন, আবু নুআইম الحلية গ্রন্থের (৯/১০৬)। খত্বীব الاحتجاج بالشافعي গ্রন্থের (৮/১) খাত্বীব থেকে ইবনু আসাকির তার গ্রন্থে

ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তাই ছহীহ হাদীছ পেলেই আমাকে জানাবেন চাই তা কূফীদের বর্ণনাকৃত হোক চাই বাছরীর হোক অথবা শামীর (সিরিয়ার) হোক বিশুদ্ধ হলে আমি তাই গ্রহণ করব।

«كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ماقلت، فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي»

(৬) যে বিষয়ে আল্লাহর রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আমার কথার বিরুদ্ধে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নিকট বিশুদ্ধরূপে কোন হাদীছ পাওয়া যাবে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম।[১]

«إذا رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي ﷺ خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب»

(৭) যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি যার বিরুদ্ধে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীছ রয়েছে তবে জেনে রেখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে।[২]

(১৫/৯/১) পৃষ্ঠা ইবনু আব্দিল বর الانتقاء গ্রন্থে পৃষ্ঠা ৭৫। ইবনুল জাউযী مناقب الإمام أحمد পৃষ্ঠা ৪৯৯ ও আলহারাবী তার গ্রন্থের (২/৪৭/২) পৃষ্ঠাতে তিনটি সূত্র পথ দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, শাফিয়ী তাঁকে (কথাটি) বলেছেন। সুতরাং কথাটি তাঁর থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। এজন্যেই ইমাম সাহেবের দিকে এর সম্বন্ধকে সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করেন ইবনুল কাইয়িম الإعلام গ্রন্থের (২/৩২৫) পৃষ্ঠা এবং আল ফুল্লানী الإيقاظ এর ১৫২ পৃষ্ঠায়। কথাটি উল্লেখ করতঃ বলেন ঃ বাইহাক্বী বলেন, এজন্যই তাঁর (ইমাম শাফি'ঈর) দ্বারা বেশী হাদীছ গ্রহণ সম্ভব হয়, তিনি হিজায, সিরিয়া, ইয়ামন ও ইরাক্ববাসীকে জমায়েত করেন, তাঁর কাছে যে হাদীছই বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়েছে তাই গ্রহণ করেছেন। এতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করেননি এবং তাঁর স্বদেশী মাযহাবের মিষ্টি কথার দিকে ধাবিত হননি। যখনই তিনি অন্য কারো নিকট হক্ব প্রকাশিত পেয়েছেন তখনই তা গ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বে যারা ছিলেন তাদের কেউ কেউ স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় মাযহাবের জানা কথার উপরেই আমল সীমাবদ্ধ রাখেন, এর বিপরীত বিষয়ের বিশুদ্ধতা জানার চেষ্টা করেননি, আল্লাহ আমাদেরকে ও তাঁদেরকে ক্ষমা করুন।

[১] আবু নুআইম তাঁর الحلية গ্রন্থে (৯/১০৭ পৃঃ), আল হারাবী তার গ্রন্থের (১/৪৭ পৃঃ), ইবনুল কাইয়িম إعلام الموقعين গ্রন্থের (২/৩৬৩ পৃঃ), আল ফুল্লানী (১০৪ পৃঃ)।

[২] ইবনু আবী হাতিম آداب الشافعي গ্রন্থে (৯৩ পৃঃ), আবুল কাসিম আস্ সামার কান্দি الأمالي তে, আরো রয়েছে আবু হাফছ আল মুআদ্দাব এর المنتقى منها (১/২৩৪)-তে আবু নুআইম الحلية (৯/১০৬ পৃঃ), ইবনু আসাকির (১৫/৯/২) বিশুদ্ধ সনদে।

«كل ماقلت، فكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي أولى، فلا تقلدوني»

(৮) আমি যা কিছুই বলেছি তার বিরুদ্ধে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ছহীহ সূত্রে হাদীছ এসে গেলে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছই হবে অগ্রাধিকারযোগ্য, অতএব আমার অন্ধ অনুসরণ করো না।[১]

«كل حديث عن النبي ﷺ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني»

(৯) নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সব হাদীছই আমার বক্তব্য যদিও আমার মুখ থেকে তা না শুনে থাক।[২]

أحمد بن حنبل رحمه الله

৪। আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাহুল্লাহ)

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ইমামগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছ সংগ্রহকারী এবং তা বাস্তবে রূপায়ণকারী ছিলেন। তাই তিনি শাখা প্রশাখামূলক কথা ও মতামত সম্বলিত কিতাব লিখা অপছন্দ করতেন।[৩]

তিনি বলেন ঃ

«لاتقلدني، ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا»

(১) তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না; মালিক, শাফিয়ী, আওযায়ী ছাউরী এদেরও কারো অন্ধ অনুসরণ করো না বরং তাঁরা যেখান থেকে (সমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর।[৪]

وفي رواية : «لاتقلد دينك أحدا من هؤلاء، ماجاء عن النبي ﷺ وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير»

---

[১] ইবনু আবী হাতিম (৯৩ পৃঃ), আবু নুআইম ও ইবনু আসাকির (১৫/৯/২) বিশুদ্ধ সনদে।

[২] ইবনু আবী হাতিম এর (৯৩-৯৪ পৃঃ)।

[৩] ইবনুল জাউযী المناقب (১১২ পৃঃ)।

[৪] আল ফাল্লানী (১১৩ পৃঃ), ইবনুল কাইয়িম الاعلام এর (২/৩০২ পৃঃ)।

অপর বর্ণনা রয়েছে ঃ তোমরা দীনের ব্যাপারে এদের কারো অন্ধ অনুসরণ করবে না। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবাদের থেকে যা কিছু আসে তা গ্রহণ কর, অতঃপর তাবিয়ীদের। তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জন্য যে কারো থেকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। আবার কোন সময় বলেছেন, অনুসরণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবাদের থেকে যা আসে তার অনুসরণ করবে অতঃপর তাবিয়ীদের পর থেকে সে (যে কারো অনুসরণে) স্বাধীন থাকবে।[১]

«رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار»

(২) আওযায়ী, মালিক ও আবু হানীফা প্রত্যেকের মতামত হচ্ছে মতামতই এবং আমার কাছে তা সমান (মূল্য রাখে), প্রমাণ রয়েছে কেবল হাদীছের ভিতর।[২]

«من رد حديث رسول الله ﷺ، فهو على شفا هلكة»

(৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করলো সে ধ্বংসের তীরে উপনীত।[৩]

এসবই হল ইমামগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বক্তব্যসমূহ যাতে হাদীছের উপর আমল করার ব্যাপারে নির্দেশ রয়েছে এবং অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ রয়েছে। কথাগুলো এতই স্পষ্ট যে, এগুলো কোন তর্ক বা ব্যাখ্যার অপেক্ষাই রাখে না।

অতএব যে ব্যক্তি ইমামদের কিছু কথার বিরুদ্ধে গেলেও সকল সুসাব্যস্ত হাদীছ আঁকড়ে ধরবেন তিনি ইমামদের মাযহাব বিরোধী হবেন না এবং তাঁদের ত্বরীকা থেকে বহিষ্কৃতও হবেন না বরং তিনি হবেন তাঁদের প্রত্যেকের অনুসারী। আরো হবেন, শক্ত হাতল মজবুতভাবে ধারণকারী, যে হাতল ছিন্ন হবার নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের বিরোধিতা করার কারণে সুসাব্যস্ত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করে তার অবস্থা এমনটি নয়, বরং সে এর মাধ্যমে তাঁদের অবাধ্য হল এবং তাঁদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর বিরোধিতা করল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي

---

[১] আবু দাউদ এর مسائل الإمام أحمد (২৭৬-২৭৭ পৃঃ)।
[২] ইবনু আব্দিল বর الجامع এর (২/১৪৯)।
[৩] ইবনুল জাউযী (১৮২ পৃঃ)।

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

অর্থ ঃ তোমার প্রতিপালকের শপথ–তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে মেনে নিবে।[১]

তিনি আরো বলেন ঃ

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

অর্থ ঃ তাই যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন ভীতিগ্রস্ত থাকে (কুফর, শিরক বা বিদআত দ্বারা) ফিৎনায় আক্রান্ত হওয়ার অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে।[২]

হাফিয ইবনু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ যার কাছেই নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ পৌছে যায় এবং তিনি তা বুঝতে পারেন তাহলে তার উপর এটাকে উম্মতের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া ও তাদের মঙ্গল কামনা করা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করার আদেশ প্রদান করা ওয়াজিব যদিও তা উম্মতের বিরাট কোন ব্যক্তিত্বের বিরোধী হয়। কেননা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ যে কোন বড় ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও অনুসরণযোগ্য, যিনি (বড় ব্যক্তিত্ব) ভুলবশত কোন কোন ক্ষেত্রে নাবীর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এজন্যেই ছাহাবাগণ ও তৎপরবর্তী লোকেরা ছহীহ হাদীছের বিরুদ্ধাচরণকারীর প্রতিবাদ করেছেন।

বরং কখনও প্রতিবাদে কঠোরতাও পোষণ করেছেন।[৩] বিদ্বেষ নিয়ে নয় বরং তিনি তাদের অন্তরের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন তাঁদের নিকট আরও প্রিয়তম এবং তাঁর আদেশ সব সৃষ্টিকুলের উর্ধ্বে। তাই যখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও অন্য কারো আদেশের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিবে তখন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ প্রাধান্য পাওয়ার ও অনুসরণের অধিক যোগ্য হবে।

---

[১] সূরা আন-নিসা ৬৫ আয়াত।

[২] সূরা আন-নূর ৬৩ আয়াত।

[৩] আমি বলছি ঃ যদিও সেই কঠোরতা স্বীয় পিতা ও উলামাদের বিরুদ্ধেও হয়। যেমন ইমাম ত্বাহাবী شرح معاني الآثار কিতাবে (১/৩৭২ পৃঃ) বর্ণনা করেন, আবু ইয়া'লা তাঁর مسند গ্রন্থে (৩/১৩১৭ পৃঃ আল-মাক্তাবুল ইসলামী প্রকাশনীর) উত্তম সনদে সালিম বিন আব্দিল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণনা করেন যার রাবীগণ বিশ্বস্ত। তিনি বলেন, আমি ইবনু উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মসজিদে বসেছিলাম, হঠাৎ তাঁর কাছে==

তবে এ নীতি নবীর বিপরীত প্রমাণিত কথার প্রবক্তার (মুজতাহিদের) বেলায় নয়, যেহেতু তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত[১] কারণ তিনি তাঁর নির্দেশের বিরোধীতাকে অপছন্দ করেন না যখন তার বিপরীতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ প্রকাশ পেয়ে যায়।[২]

আমি বলছি ঃ কিভাবেইবা তাঁরা এটাকে অপছন্দ করবেন অথচ তাঁরা স্বীয় অনুসারীদেরকে এ বিষয়ে আদেশ প্রদান করেন, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা অনুসারীদের উপর ওয়াজিব করেন নিজেদের কথাকে সুন্নাতের মোকাবিলায় পরিহার করতে। বরং ইমাম শাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর

সিরিয়ার এক লোক আগমন করে এবং তাঁকে তামাত্তু হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ইবনু উমর বললেন ঃ এই প্রকার হজ্জ ভাল ও সুন্দর; লোকটি বলল ঃ আপনার পিতাও এই হজ্জ থেকে নিষেধ করতেন। ইবনু উমর বললেন ঃ তোমার ধ্বংস হোক! আমার পিতা যদিও এ হজ্জ থেকে নিষেধ করেছেন কিন্তু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা করেছেন এবং এর আদেশ দিয়েছেন, তুমি কি আমার পিতার কথা গ্রহণ করবে নাকি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ? লোকটি বলল– রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশই শিরোধার্য হবে। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে উঠে চলে যাও। (আহমাদ হাঃ ৫৭০০) এই অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেন, (তিরমিযী ২/৮২ ভাষ্য, তুহফাতুল আহওয়াজীসহ) এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন, ইবনু আসাকির (৭/৫১/১) ইবনু আবি যি'ব থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন ঃ সা'দ বিন ইবরাহীম (অর্থাৎ আব্দুর রহমান বিন আওফের ছেলে) এক ব্যক্তির উপর রাবী'আহ বিন আবি আব্দির রহমান এর মত দ্বারা ফায়ছালা প্রদান করেন, আমি তাঁকে আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে তার ফায়ছালার বিপক্ষে হাদীছ শুনালাম, তাতে সা'দ রাবী'আহকে বললেন ঃ এ হচ্ছে ইবনু আবি যি'ব সে আমার কাছে বিশ্বস্ত। সে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আপনার ফায়ছালার বিরুদ্ধে হাদীছ পেশ করছে, রাবী'আহ তাকে বললেন ঃ আপনি ইজতিহাদ করেছেন এবং আপনার ফায়ছালা প্রদানও সম্পন্ন হয়েছে, তখন সা'দ বললেন ঃ কি আশ্চর্য আমি সা'দের ফায়ছালা বাস্তবায়ন করব আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফায়ছালা বাস্তবায়ন করব না? বরং আমি সা'দের মায়ের ছেলে সা'দ এর ফায়ছালাকে প্রত্যাখ্যান করব। আর আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফায়ছালা বাস্তবায়ন করব এই বলে সা'দ বিচারপত্র হাজির করতে বলেন এবং তা ছিঁড়ে ফেলেন আর যার বিরুদ্ধে ফায়ছালা দিয়েছিলেন তার পক্ষে রায় প্রদান করেন।

(১) আমি বলছি ঃ বরং তিনি প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ঃ হাকিম (শাসক) যদি ইজতিহাদ করে ফায়ছালা প্রদান করেন আর তা সঠিক হয় তবে তাঁর জন্য দু'টি প্রতিদান। আর যদি ইজতিহাদ করে ফায়ছালা প্রদান করেন এবং তাতে ভুল করে ফেলেন তবে তার জন্য একটি প্রতিদান। (বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য)

(২) إيقاظ الهمم এর টীকায় তা উদ্ধৃত করেন (৯৩ পৃষ্ঠা)।

সাথীদেরকে আদেশ দেন যে, তারা যেন বিশুদ্ধ হাদীছকে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে, যদিওবা তিনি এটি গ্রহণ করেননি অথবা এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

এ জন্যই তত্ত্ববিদ ইবনু দাক্বীক্বিল ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) সেসব বিষয়গুলো একত্রিত করেন যাতে চার ইমামের মাযহাবই বিশুদ্ধ হাদীছের বিরোধিতা করেছে– এককভাবে বা যৌথভাবে, এবং তা এক বৃহৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার শুরুতে তিনি বলেন ঃ মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে এ সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধ করা হারাম, তাঁদের অন্ধ অনুসারী ফক্বীহদের কর্তব্য হবে এগুলো জানা, যাতে ইমামগণের দিকে এসবের সম্বন্ধ জড়িয়ে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ না করতে হয়।[১]

সুন্নাহ্ অনুসরণ করতে যেয়ে ইমামগণের অনুসারীদের কর্তৃক তাঁদের কিছু কথা পরিহারের নমুনা

পূর্বোল্লিখিত কারণ সাপেক্ষে ইমামগণের অনুসারীদের–

﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴾

পূর্ববর্তীদের অধিক সংখ্যক এবং পরবর্তীদের অল্প সংখ্যক[২] লোক স্বীয় ইমামদের সব কথা গ্রহণ করতেন না বরং তাদের অনেক কথাই তাঁরা বাদ দিয়েছেন যখন সুন্নাহ্ বিরোধী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। এমনকি ইমামদ্বয় মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁদের শাইখ আবু হানীফার (রহঃ) প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাযহাব-এ বিরোধিতা করেছেন।[৩] ফিকহের কিতাবগুলোই একথার বর্ণনার জন্য যথেষ্ট।

এ ধরনের কথা ইমাম মুযানী[৪] ও ইমাম শাফি'ঈর অন্যান্য অনুসারীদের

---

[১] আল ফাল্লানী (৯৯ পৃঃ)

[২] সূরা ওয়াক্বিআহ ১৩-১৪ আয়াত

[৩] ইবনু আবিদীন الحاشية এর (১/৬২ পৃঃ), লক্ষ্ণৌভী النافع الكبير (৯৩ পৃঃ), উক্ত কথার সম্বন্ধ গাযালীর দিকে করেছেন।

[৪] তিনি তাঁর শাফি'ঈ ফিকহ্ সংক্ষেপায়ণ ؛ مختصر في فقه الشافعي গ্রন্থের শুরুতে বলেন, যা ইমাম শাফি'ঈর গ্রন্থ الأم এর টীকায় ছাপানো হয়েছে। কথাটি হচ্ছে, আমি এই কিতাবটি সংক্ষেপ করেছি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশশাফি'ঈ (রাহিমাহুল্লাহ)-এর ইল্‌ম থেকে এবং তাঁর কথার মর্ম নিয়ে যাতে করে আগ্রহী ব্যক্তির নিকটবর্তী করে দিতে পারি। সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছি ইমাম সাহেব কর্তৃক তাঁর বা অন্য কারো অন্ধ অনুসরণের নিষেধাজ্ঞার কথা যাতে করে সে তার দ্বীনের ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারে এবং তাঁর ব্যাপারে নিজের স্বার্থেই সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে।

বেলায়ও প্রযোজ্য। আমরা যদি এর উপর দৃষ্টান্ত পেশ করতে যাই তবে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং এই বইয়ে আমি সংক্ষেপায়নের যে উদ্দেশ্য পোষণ করেছি তা থেকেও বেরিয়ে পড়ব।

তাই দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব ঃ

১। ইমাম মুহাম্মদ তাঁর "মুওয়াত্তা"[১] গ্রন্থে বলেন (১৫৮ পৃঃ) ঃ আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ্) ইসতিসকার কোন ছলাত আছে বল মনে করতেন না। তবে আমার কথা হচ্ছে যে, ইমাম লোকজনকে নিয়ে দু'রাকাআত ছলাত পড়বেন, অতঃপর দু'আ করবেন এবং স্বীয় চাদর পাল্টাবেন শেষ পর্যন্ত।

২। ইছাম বিন ইউসুফ আল বালখী যিনি ইমাম মুহাম্মদ এর সাথী ছিলেন[২] এবং ইমাম আবু ইউসুফ এর সংশ্রবে থাকতেন[৩] তিনি ইমাম আবু হানীফার কথার বিপরীত অনেক ফাতওয়া প্রদান করতেন, কেননা (আবু হানীফা) যেগুলোর দলীল জানতেন না অথচ তার কাছে অন্যদের দলীল প্রকাশ পেয়ে যেত, তাই সেমতেই ফাতওয়া দিয়ে দিতেন।[৪] তাই তিনি রুকুতে গমনকালে ও রুকু থেকে উঠার সময় হস্তযুগল উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করতেন।[৫] যেমনটি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনায়

---

[১] তিনি এই গ্রন্থে প্রায় বিশটা বিষয়ে স্বীয় ইমামের বিরোধিতা করেন, এর স্থানগুলোর প্রতি (পৃষ্ঠা উল্লেখ করতঃ) ইঙ্গিত করে দিচ্ছি– ৪২, ৪৪, ১০৩, ১২০, ১৫৮, ১৬৯, ১৭২, ১৭৩, ২২৮, ২৩০, ২৪০, ২৪৪, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪, ৩১৪, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৫৫, ৩৫৬; মুওয়াত্বা মুহাম্মদ এর টীকা আত্তা'লীকুল মুমাজ্জাদ التعليق الممجد على موطا محمد থেকে সংগৃহীত।

[২] তার কথা ইবনু আবিদীন তার الحاشية তে উল্লেখ করেন (১/৭৪) ও رسم المفتي গ্রন্থে (১/১৭) কুরাশী এটিকে আল জাওয়া হিরুল মুযীয়াহ্ ফী তুবাকাতিল হানাফিয়াহ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (৩৪৭ পৃঃ) তে উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ তিনি হাদীছের অনুসারী বিশ্বস্ত লোক ছিলেন, তিনি ও তাঁর ভাই ইবরাহীম স্বীয় যুগে বলখের দুই শাইখ ছিলেন।

[৩] আল-ফাওয়াদুল বাহীইয়াহ্ ফী তারাজিমিল হানাফিয়াহ–
الفوائد البهية في تراجم الحنفية

[৪] আল-বাহ্রুররাইক البحر الرائق (৬/৯৩), রাসমুল মুফতী رسم المفتي, (১/২৮ পৃঃ)

[৫] আল ফাওয়াইদ الفوائد (১১৬ পৃঃ) অতঃপর সুন্দর টীকা সংযোজন করে বলেন ঃ আমি বলছি, এ থেকে জানা গেল আবু হানীফা (রহঃ) থেকে মাকহুলের এ বর্ণনাটির বাত্বিল হওয়ার কথা যাতে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি ছলাতে রাফউল ইয়াদাইন করবে তার ছলাত বিনষ্ট হবে। এ সেই বর্ণনা যেটি নিয়ে আমীর কাতিব আল ইতকানী বিভ্রান্ত হয়েছেন। যেমনটি তার জীবনীতে বর্ণিত হয়েছে। কেননা ইছাম বিন ইউসুফ আবু ইউসুফ এর সহচরবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তিনি রাফউল ইদাইন করতেন। অতএব

এসেছে। তাঁর তিন ইমাম কর্তৃক এর বিপরীত বক্তব্য তাকে এ সুন্নাতে মানতে বাধা দেয়নি। এই নীতির উপরেই প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে অটল থাকা ওয়াজিব, তার ইমাম ও অন্যান্যদের সাক্ষ্য দ্বারা এটাই ইতিপূর্বে প্রতীয়মান হয়েছে।

সারকথা ঃ আমি আশা করব কোন মুক্বাল্লিদ (ভাই) তাড়াহুড়া করে এই কিতাবে অনুসৃত পন্থার উপর আঘাত হানবেন না এবং স্বীয় মাযহাবের বিরোধিতার অজুহাত পেশ করে এতে সন্নিবেশিত সুনান (হাদীছ) সমূহের উপর আমল পরিত্যাগ করবেন না।

বরং আমি আশা করি তিনি আবশ্যকীয়ভাবে সুন্নাত প্রতিপালনে ও ইমামদের সুন্নাত বিরোধী কথা পরিত্যাগের ব্যাপারে পূর্বোল্লিখিত ইমামদের উক্তিগুলো স্মরণ করবেন। জানা উচিত যে, এই পদ্ধতির (দৃষ্টিভঙ্গির) উপর অপবাদ হানা অন্ধভাবে অনুসৃত ইমামের উপরেই অপবাদ হানার নামান্তর, তিনি যে ইমামই হোন, কেননা আমি এই পদ্ধতি তাঁদের (ইমামদের) থেকেই গ্রহণ করেছি, যেমন ইতিপূর্বে তার বর্ণনা অতিবাহিত হল। তাই যে ব্যক্তি এই পথে তাদের থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ না করল সে মহাবিপদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হল। কেননা তা সুন্নাত থেকে বিমুখ হওয়াকে নিশ্চিত করে, অথচ মতানৈক্যের ক্ষেত্রে হাদীছ অনুসরণ করতে এবং তার উপর ভরসা রাখতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا

যদি এই বর্ণনার কোন ভিত্তি থাকত তবে আবু ইউসুফ ও ইছাম তা জানতেন। তিনি বলেন ঃ এ থেকে আরো জানা যায় যে, যদি কোন হানাফী কোন এক বিষয়ে স্বীয় ইমামের মাযহাব পরিত্যাগ করে প্রতিপক্ষের দলীল শক্তিশালী হওয়ার ভিত্তিতে– তবে এর কারণে তিনি তাঁর তাক্বলীদ থেকে বেরিয়ে পড়েন না বরং তা হবে তাক্বলীদ পরিহারের রূপধারী প্রকৃত তাক্বলীদ। তুমি কি দেখনা ইছাম বিন ইউসুফ তিনি রাফউল ইয়াদাইন না করার ব্যাপারে আবু হানীফার মাযহাব পরিত্যাগ করেন। তার পরেও তাকে হানাফী গণনা করা হয়? তিনি বলেন ঃ অভিযোগ আল্লাহর কাছেই পেশ করছি আমাদের যুগের অজ্ঞ লোকদের ব্যাপারে। কারণ কেউ শক্তিশালী দলীলের ভিত্তিতে ইমামের একটি মাসআলা পরিহার করলে তারা তাকে দোষারোপ করে। এমনকি মাযহাব থেকে বহিষ্কার করে দেয়। তবে তারা যেহেতু সাধারণ পাবলিক তাই তাদের ব্যাপারে আশ্চর্যের কিছু নেই, আশ্চর্য হতে হয় তাদের বেলায় যারা উলামাদের বেশ ধরেও তাদের (অজ্ঞদের) চালচলনের মত চালচলন প্রদর্শন করে যেন চতুষ্পদ জন্তু।

فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

অর্থ ঃ তোমার রবের শপথ তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে তোমাকে বিচারক মেনে নিবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা পোষণ করবে না, এবং তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিবে।[১]

আল্লাহর কাছে দু'আ করছি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের ব্যাপারে তিনি বলেছেন ঃ

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾

অর্থ ঃ মু'মিনদেরকে যখন তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের বক্তব্য এই হওয়া উচিত যে, তারা বলবে ঃ আমরা শুনলাম এবং মানলাম আর তারাই হচ্ছে সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আর আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তির বিষয়ে আতঙ্কিত থাকে তারাই কৃতকার্য।[২]

কিছু সংশয় ও তার উত্তর

এসব সংশয়ের জবাব দেয়া হচ্ছে এজন্য যে, দশ বৎসর পূর্বে অত্র কিতাবের ভূমিকায় যা লিখেছিলাম এই অল্প সময়েই আমি মুসলিম যুব সমাজে দীন ও ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামের স্বচ্ছ প্রস্রবণ কুরআন ও হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করা অপরিহার্য হওয়ার দিশা দানে তার চমৎকার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্যে সুন্নাহ মান্যকারী এবং এর মাধ্যমে ইবাদতকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি তারা এই আদর্শে পরিচিতিও লাভ করে ফেলেছে। তবে অন্যদিকে তাদের কিছু সংখ্যককে আবার সুন্নাহ অনুসরণ করা থেকে থেমে থাকতে দেখেছি। আর এমনটি হয়েছে সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশমূলক আয়াত ও ইমামগণের উক্তিসমূহ উল্লেখ করার পর উক্ত নীতির অপরিহার্যতার ব্যাপারে সন্দেহ বশতঃ নয় বরং কিছু মুকাল্লিদের মাশাইখদের কাছ থেকে শ্রুত সংশয়ের ভিত্তিতে। তাই আমি সেগুলো উল্লেখ করে তার সমুচিত জবাব দানের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি এই আশায় যে, তারাও সুন্নাহ অনুসরণকারীদের সাথে

[১] সূরা আন-নিসা ৬৫ আয়াত

[২] সূরা আন-নূর ৫১-৫২ আয়াত

যোগ দিয়ে তার উপর আমল শুরু করে দিবেন এবং এতে করে তাঁরা আল্লাহর ইচ্ছায় মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।

প্রথম সংশয় ঃ তাদের কেউ কেউ বলেন, আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ মেনে নেওয়া নিঃসন্দেহে ওয়াজিব। বিশেষ করে নিছক ইবাদতের ক্ষেত্রে গবেষণা ও মতামতের কোন সুযোগ নেই। কেননা এগুলো শুধু দলীল নির্ভর বিষয় যেমন ছলাত, কিন্তু আমি মুকাল্লিদ শাইখদের কারো নিকট থেকে এই বিষয়ে আদেশ দিতে শুনিনি বরং তাদেরকে দেখেছি তারা মতভেদকে স্বীকার করেন এবং এটাকে জাতির পক্ষে সুবিধাজনক ব্যাপার বলে ধারণা করেন। তারা এর স্বপক্ষে দলীল হিসাবে একটি হাদীছ পেশ করেন যেটিকে প্রায়ই তারা এরকম পরিস্থিতি সামনে আসলে সুন্নতের ঝাণ্ডা বাহীদের প্রতিবাদে আওড়িয়ে থাকে। যা হচ্ছে– اختلاف أمتي رحمة, অর্থাৎ– আমার উম্মতের মতানৈক্য রাহমাতস্বরূপ। আমরা দেখছি যে, এ হাদীছ আপনি যে পথের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন তার এবং আপনার অত্র গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থাদির বিরোধিতা করছে। অতএব এ হাদীছ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর, দু'ভাবে হবে ঃ

প্রথম উত্তর ঃ হাদীছটি বিশুদ্ধ নয়, বরং তা বাত্বিল, তার কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা সুবকী বলেন ঃ আমি এ হাদীছের সূত্র পাইনি– না ছহীহ, না যঈফ, না জাল হাদীছ।

আমি বলছি ঃ বরং এ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

«...... اختلاف أصحابي لكم رحمة»

অর্থ ঃ .....আমার ছাহাবাদের মতভেদ তোমাদের জন্যে রাহমাত।

«أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم»

অর্থ ঃ "আমার ছাহাবাগণ তারকারাজির ন্যায়, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে।" এই উভয় বাক্যই বিশুদ্ধ নয়, প্রথমটি মারাত্মক দুর্বল, আর দ্বিতীয়টি জাল। আমি সবক'টিকে «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» গ্রন্থের ৫৮-৫৯, ৬১ নম্বরে যাচাই করে দেখেছি।

দ্বিতীয় উত্তর ঃ হাদীছটি যঈফ হওয়ার সাথে সাথে তা কুরআন বিরোধীও বটে। কেননা মতবিরোধ থেকে বিরত ও ঐকমত্য থাকার ব্যাপারে আদেশ সংক্রান্ত আয়াত এত বেশী প্রসিদ্ধ যে, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তবে

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾

অর্থ ঃ আর তোমরা পরস্পরে বিবাদ কর না, তাহলে অকর্মন্য হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে।[১] তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾

অর্থ ঃ আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর নিজেরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত।[২] তিনি আরো বলেন ঃ

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ﴾

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা যাদেরকে অনুগ্রহ করেন তারা ব্যতীত অন্যান্যরা সর্বদা মতভেদ করতেই থাকবে।[৩]

তোমার প্রতিপালক তাদেরকে অনুগ্রহ করেন যারা মতভেদ করে না, সুতরাং বুঝা গেল যারা বাত্বিলপন্থী তারাই মতভেদ করে। তবে কোন্ বিবেক বলবে যে, মতভেদ রাহমাত?

অতএব সাব্যস্ত হল যে, এ হাদীছ বিশুদ্ধ নয়, না সনদের (সূত্রের) দিক দিয়ে আর না মাতনের (শব্দের) দিক দিয়ে।[৪] এখনি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ হাদীছকে সংশয়ের উৎস বানানো বৈধ নয়– কুরআন হাদীছের উপর আমল বন্ধ রাখার জন্য যে ব্যাপারে ইমামগণও আদেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় সংশয় ঃ যখন দীনের ব্যাপারে মতভেদ নিষিদ্ধ হল তবে ছাহাবা ও তাঁদের পরবর্তী ইমামগণের মতভেদ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? আর তাঁদের মতবিরোধ ও পরবর্তীদের মতপার্থক্যের মধ্যে কি কোন তফাৎ রয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, উভয় মতানৈক্যের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে যা দু'টি বিষয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়।

এক– মত পার্থক্যের কারণ।

দুই– তার প্রতিক্রিয়া।

---

[১] সূরা আনফাল ৪৬ আয়াত

[২] সূরা আর রুম ৩১-৩২ আয়াত

[৩] সূরা হুদ ১১৮-১১৯ আয়াত

[৪] যে ব্যক্তি বিস্তারিত জানতে চান এব্যাপারে তার পক্ষে উপরোক্ত গ্রন্থাদি পড়া উচিত।

ছাহাবাদের মধ্যকার মতভেদ ছিল অনিবার্য কারণ সাপেক্ষে, যা তাদের বুঝের বেলায় স্বভাবগতভাবেই সংঘটিত হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। এর সাথে আরো কিছু বিষয় যোগ হবে যা তাঁদের যুগে মতবিরোধকে অপরিহার্য করেছিল যা তৎপরবর্তীকালে দূর হয়ে যায়।[১] আর এটি এমন মতানৈক্য যা থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। উপরোক্ত আয়াত বা তার সমার্থবোধক আয়াতসমূহের নিন্দাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কেননা এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার শর্ত বিদ্যমান নেই। আর তা হচ্ছে ইচ্ছা বা পীড়াপীড়ি করে অটল থাকা।

কিন্তু বর্তমান যুগের অন্ধ অনুসরণকারীদের (মুকাল্লিদদের) মধ্যকার মতভেদ এমন পর্যায়ের যাতে সাধারণত কোন উযর নেই। কেননা তাদের কারো নিকট কখনো কুরআন হাদীছের এমন দলীল প্রকাশিত হয় যা সাধারণত তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করেন না তার সমর্থন করে তখন তিনি শুধু এজন্যই তা পরিত্যাগ করেন যে এটি তাঁর মাযহাবের বিপরীত– আর অন্য কোন কারণে নয়। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মাযহাবটাই তাঁর কাছে যেন আসল অথবা এটাই সেই দ্বীন যা নিয়ে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেছেন, আর অন্য মাযহাব হচ্ছে ভিন্ন আরেক ধর্ম যা রহিত হয়ে গেছে।

অপর আরেক দল এদের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা এই বিস্তর মতানৈক্যপূর্ণ মাযহাবগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত মনে করেন যেমন স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের পরবর্তীদের কেউ কেউ একথা বলেছেন[২] ঃ

«لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاء، ويدع ما شاء، إذ الكل شرع»

অর্থ ঃ মুসলিম ব্যক্তির বেলায় কোন আপত্তি নেই এ সব মাযহাব থেকে যেটা ইচ্ছে গ্রহণের ও যেটা ইচ্ছে বর্জনের যেহেতু এগুলোর প্রত্যেকটি (স্বতন্ত্র) শরীয়ত।

আর উভয় প্রকারের লোকজনই কখনও কখনও সেই বাতিল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে «اختلاف أمتي رحمة» আমার উম্মতের মতভেদ রাহমাত। তাদেরকেও উক্ত হাদীছ দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করতে শুনেছি। তাদের কেউ আবার এই হাদীছের কারণও দর্শায় এই বলে যে, মতভেদটা এজন্যই রাহমাত যে, এতে জাতির উপর উদারতা প্রদর্শন করা হয়।

এই ব্যাখ্যাটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের স্পষ্ট বিরোধী ও ইমামগণের পূর্বোল্লিখিত বক্তব্য সমূহের মর্মবিরোধী হওয়া ছাড়াও তাদের কারো কারো স্পষ্ট প্রতিবাদও এর বিরুদ্ধে এসেছে।

---

[১] দেখুন ইবনু হাযম এর "আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম" الإحكام في أصول الأحكام এবং দেহলভীর حجة الله البالغة অথবা এ বিষয়ের উপর লিখা তাঁর পুস্তিকা ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি অত্তাক্বলীদ। عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد

[২] দেখুন মানাবীর فيض القدير (১/২০৯) অথবা সিলসিলাতুল আহাদীছিয্যয়ীফাহ অল মাউযূআহ سلسلة الأحاديث الضعيفة। (১/৭৬, ৭৭)

ইবনুল কাসিম বলেন ঃ আমি মালিক এবং লাইছকে বলতে শুনেছি রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবাদের মতবিরোধ সম্পর্কে লোকজন যে রকম বলে যে, এতে উদারতা রয়েছে তা সঠিক নয় বরং তা হচ্ছে ভুল শুদ্ধের ব্যাপার মাত্র।[১]

আশহাব বলেন ঃ ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিশ্বস্ত কোন ছাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীছের কোন একটি হাদীছ অবলম্বন করল— আপনি কি তাকে এ ব্যাপারে স্বাধীন মনে করেন?

তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, না, যতক্ষণ হক্ব পর্যন্ত না পৌছে, হক্বতো একটাই, বিপরীতমুখী দু'টি কথাকি একই সাথে সঠিক হয়? সত্য ও সঠিকতো একটাই হয়।[২]

ইমাম শাফি'ঈর সাথী মুযানী বলেন ঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবাগণ মতবিরোধ করেছেন, তাঁদের একজন অপরজনের ভুল ধরেছেন এবং তাদের একজন অপরজনের মতামত বিবেচনা করে দেখেছেন এবং তার উপর মন্তব্য করেছেন। যদি তাঁদের সব কয়টি কথা সঠিকই হত তাঁদের কাছে, তবে তাঁরা এমনটি করতেন না।

আর উমর ইবনুল খাত্তাব উবাই ইবনু কা'ব এবং ইবনু মাসউদ এর মতানৈক্যের উপর রাগান্বিত হন তারা যখন একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে ছলাত (বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়ার) ব্যাপারে উভয়ে মতবিরোধ করছিলেন যখন উবাই বললেন ঃ একটি কাপড়ে ছলাত আদায় করা সুন্দর ও চমৎকার কাজ। আর ইবনু মাসউদ বললেন, এটা তো কেবল ঐ সময়কার কথা যখন কাপড় কম ছিল। তখন উমর রাগান্বিত হয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন দু'জন ছাহাবী মতভেদ করছেন যাদের অনুকরণ করা হয় এবং যাদের কথা গ্রহণীয়। তবে উবাই সঠিক বলেছেন আর ইবনু মাসউদ চেষ্টায় ত্রুটি করেননি। কিন্তু আমার আজকের এই বক্তব্য শুনার পর যে কাউকে এ বিষয়ে মতভেদ করতে শুনব তাকেই এই এই (শাস্তি প্রদান) করব।[৩]

ইমাম মুযানি আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি মতভেদকে জায়েয রাখে এবং এই ধারণা পোষণ করে যে, কোন বিষয়ে যদি দু'জন আলিম মতবিরোধ করেন এবং একজন বলেন ঃ এটা হালাল আর অপরজন বলেন ঃ এটা হারাম? তবে তাদের উভয়জনই তাদের গবেষণায় হক্বের উপর আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে—

---

[১]ইবনু আব্দিল বার এর জা-মিউ বায়ানিল ইল্ম (২/৮২, ৮৮, ৮৯)
[২]উপরোক্ত কিতাবের (২/৮৩, ৮৪)।

তুমি এ কথা দলীল ভিত্তিক বলেছো, নাকি ক্বিয়াস (অনুমান) ভিত্তিক? যদি বলে ঃ দলীল ভিত্তিক, তবে তাকে বলা হবে কিভাবে দলীল ভিত্তিক হয় অথচ কুরআন (এর বিপক্ষে) মতানৈক্যকে নিষেধ করছে তুমি কিভাবে সেখানে তার বৈধতার উপর ক্বিয়াস করছ। এটা কোন আলিমতো দূরের কথা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বৈধ বলতে পারে না।[১]

যদি কেউ বলে–ঃ আপনি ইমাম মালিক থেকে যা উল্লেখ করলেন যে হক্ব একটাই হয় একাধিক হয় না, তাতো উস্তায যারক্বা তার আলমাদখালুল ফিক্বহী গ্রন্থের المدخل الفقهي (১/৮৯) তে যা লিখেছেন তার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে ঃ আবূ জা'ফর আল মানছূর এবং তাঁর পরে রাশীদ মনস্থ করেন যে, ইমাম মালিক এর মাযহাব ও তাঁর কিতাব الموطا কে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সংবিধান হিসাবে পরিগণিত করবেন তাতে মালিক উভয়কে বাধা দেন এবং বলেন ঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছাহাবাগণ (ফিক্বহের) অমৌলিক বিষয়ে মতভেদ করেছেন এবং দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন আর তাদের প্রত্যেকেই সঠিক।

আমি বলছি ঃ এ ঘটনাটি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু শেষের কথাটি "প্রত্যেকেই সঠিক" তার কোন ভিত্তি আমি জানতে পারিনি– ঐ সকল বর্ণনা ও গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমি যেগুলো ওয়াক্বেফহাল হয়েছি।[২] তবে আবু নুআইম الحلية আল হিলইয়াহ্ গ্রন্থের (৬/৩৩২ পৃঃ) তে একটি মাত্র বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যাতে মিক্বদাম ইবনু দাউদ রয়েছে, একে যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া এর শব্দ হচ্ছে ঃ وكل عند نفسه مصيب অর্থ ঃ প্রত্যেকেই নিজের বিচারে সঠিক।

তার কথা عند نفسه প্রমাণ বহন করে যে, المدخل এর বর্ণনা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনটি কেনই বা হবে না যেখানে এটা ইমাম মালিক থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধিতা করছে যা হচ্ছে এই যে, হক্ব এক, তা একাধিক হয় না যেমন এর আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গেল। এর উপরে ছাহাবা তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমাম চতুষ্টয় ও অন্যান্য ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ইবনু আব্দিল বর বলেন ঃ (২/৮৮ পৃঃ) সংঘাতপূর্ণ দুই পক্ষের উভয় বক্তব্যই যদি সঠিক হত তবে সালাফদের একজন অপরজনের গবেষণা, বিচার এবং ফাতওয়াতে ভুল ধরতেন না। বিবেকও একথা অস্বীকার করে যে, কোন বস্তু আর

---

[১] উপরোক্ত কিতাবের (২/৮৯)।

[২] ইবনু আব্দিল বার এর আল-ইনতিকা' الانتقاء (৪১) ও হাফিয ইবনু আসাকির এর কাশফুল মুগত্বা-ফী-ফাযলিল মুওয়াত্তা كشف المغطا في فضل الموطا (৬-৭ পৃঃ) ও যাহাবীর তাযকিরাতু হুফফায تذكرة الحفاظ (১/১৯৫ পৃঃ)

তার বিপরীতমুখী বস্তু উভয়টাই সঠিক হবে। কি সুন্দরইনা বলেছেন যিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেছেন ঃ

إثبات ضدين معا في حال ـ أقبح ما يأتي من المحال ※

অর্থ ঃ দু'টি বিপরীতমুখী বস্তুকে একই অবস্থায় এক সাথে সাব্যস্ত করা ঘৃণ্যতম অসম্ভব।

যদি বলা হয় ঃ এই বর্ণনা যদি ইমাম থেকে ভুল সাব্যস্তই হয়, তবে মানছূর যখন মানুষকে তাঁর কিতাব الموطأ এর উপর ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি কেন তা গ্রহণ না করে অস্বীকৃতি জানান?

আমি বলছি ঃ সর্বাধিক সুন্দরতম যে বর্ণনা সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি তা হচ্ছে ঐটি যেটি হাফিয ইবনু কাছীর তার শারহ ইখতিছারি উলূমিল হাদীছ গ্রন্থের ৩১ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালিক বলেন ঃ লোকজন এমন সব বিষয় একত্রিত করেছে ও জেনেছে যা আমি (হয়ত) জানতে পারিনি। একথা তাঁর (ইমাম মালিকের) জ্ঞান ও ইনছাফের পূর্ণতার প্রমাণ– যেমন ইবনু কাছীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

সুতরাং সাব্যস্ত হল যে, সব মতভেদই মন্দ এবং তা রাহমাত নয়। তবে কোন কোন মতভেদ এমন রয়েছে যার উপর মানুষকে পাকড়াও করা হবে যেমন গোঁড়া মাযহাব পন্থীদের মতভেদ। আর কোনটি এমন যে, তার উপর পাকড়াও করা হবে না যেমন ছাহাবাহ এবং তাঁদের অনুসারী ইমামগণের মতভেদ। আল্লাহ তাদের দলে আমাদের হাশর করুন এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন। এখন প্রকাশ পেল যে, ছাহাবাগণের মতভেদ ছিল মুক্বাল্লিদদের মতভেদ থেকে আলাদা।

সারকথা ঃ ছাহাবাগণ নিরুপায় অবস্থায় মতভেদ করেছেন কিন্তু তাঁরা মতভেদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং যতদূর সম্ভব এ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। পক্ষান্তরে মুক্বাল্লিদগণ মতভেদপূর্ণ বিষয়ের বিরাট এক অংশে এই মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তারা একমত হয় না এবং এর জন্য চেষ্টাও করে না, বরং তারা একে সাব্যস্ত করে। তাই উভয় মতবিরোধের মধ্যে বিরাট দূরত্ব রয়েছে। এই পার্থক্য ছিল কারণের দিক থেকে।

আর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে উভয় মতভেদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আরো স্পষ্ট, আর তা এই যে, ছাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) অমৌলিক বা খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ করা সত্ত্বেও– তাঁরা ঐক্যের ভাব মূর্তিকে কঠিনভাবে সংরক্ষণ করতেন। যে সব বিষয় ঐক্য বাণীর মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিরত থাকতেন। যেমন তাদের মধ্যে কেউ সশব্দে বিসমিল্লাহ বলার পক্ষে মত ব্যক্ত করতেন আবার কেউ এটি ঠিক মনে করতেন না। তাদের কেউ

রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব মনে করতেন আবার কেউ তা মনে করতেন না। এমনিভাবে কেউবা মহিলা স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে ছিলেন আবার অন্যরা ছিলেন এর বিপক্ষে। তা সত্ত্বেও তারা সবাই এক ইমামের পিছনে ছলাত পড়তেন এবং মাযহাবী মতানৈক্যকে কেন্দ্র করে তাঁদের কেউ ইমামের সাথে ছলাত পড়া থেকে বিরত থাকেননি। পক্ষান্তরে মুকাল্লিদগণের অন্ধ অনুসারীগণের মতবিরোধ হচ্ছে সম্পূর্ণ এর বিপরীত। যার পরিণতি এই দাঁড়িয়েছে যে, মুসলিমগণ দুই সাক্ষ্যবাণী তথা আল্লাহ ও রসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পর পরই সর্বপ্রধান ভিত্তি ছলাতের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা সবাই একত্রে এক ইমামের পিছনে ছলাত পড়তে অস্বীকৃতি জানায় এই বলে যে, ভিন্ন মাযহাবের ইমামের ছলাতে বাত্বিল আর না হয় অন্ততপক্ষে মাকরূহ। আমরা একথা শুনেছি এবং দেখেছি যেমন অন্যরাও দেখেছে।[১]

কেনইবা তা হবে না যেখানে আজকের দিনে প্রসিদ্ধ কিছু মাযহাবের কিতাবে স্পষ্টাক্ষরে ছলাত মাকরূহ বা বাত্বিল হওয়ার কথা বিদ্যমান রয়েছে? যার পরিণতি হিসাবে আপনি কোন কোন দেশে একই জামে মসজিদে চারটা মেহরাব দেখতে পাবেন যাতে পর পর চারজন ইমাম ছলাত পড়ান। লোকজনকে দেখতে পাবেন তাদের ইমামের জন্য অপেক্ষা করছে অথচ অপর আরেকজন ইমাম দাঁড়িয়ে ছলাত পড়ছেন।

বরং কিছু মুকাল্লিদদের নিকট মতানৈক্য এই পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে যে, তারা হানাফী বর এবং শাফি'ঈ কন্যার মধ্যে বিয়ে নিষেধ করেছে। পরবর্তীতে হানাফীদের নিকট প্রসিদ্ধ এক লোক যাকে مفتي الثقلين জিন ইনসান উভয় জাতির মুফতী উপাধিতে ভূষিত করা হয় তিনি হানাফী পুরুষের সাথে শাফি'ঈ কন্যার বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা দেন এই কারণ দর্শিয়ে যে, সেই মহিলাকে আহলুল কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) পর্যায়ভুক্ত ধরে নেয়া হবে।[২] যার অর্থ এই যে, (আর তাদের নিকট কিতাবাদির অর্থই গ্রহণযোগ্য)-এর বিপরীত বৈধ নয় অর্থাৎ শাফি'ঈ বরের সাথে হানাফী কন্যার বিয়ে বৈধ নয় যেমন কিতাবী (ইহুদী-খৃষ্টান) বরের সাথে মুসলিম কন্যার বিবাহ বৈধ নয়।

অনেক দৃষ্টান্ত থেকে এ দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা গেল যা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য ঐ অশুভ পরিণতির কথা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছে যা পরবর্তীদের মতবিরোধ এবং এর উপর জড়বদ্ধ থাকার ফলশ্রুতিতে ঘটেছে। এটা পূর্বসুরীদের মতভেদের

---

[১] দেখুন মা-লা-ইয়াজুয ফীহিল খিলাফ مالا يجوز فيه الخلاف কিতাবের অষ্টম পরিচ্ছেদ (৬৫-৭২ পৃঃ) তাতে অনেক দৃষ্টান্ত পাবেন যে বিষয়ের প্রতি আমি ইঙ্গিত করেছি। যার কিছু আযহার (বিশ্ববিদ্যালয়)-এর আলিমদের দ্বারাও ঘটেছে।

[২] البحر الرائق (আল-বাহরুর রা-ইক্ব)।

চেয়ে ভিন্ন। কেননা তাদের মতপার্থক্যের কোন অশুভ পরিণতি জাতির উপর পতিত হয়নি। এজন্যই তাঁরা দ্বীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা বহনকারী আয়াতগুলোর আওতার বাহিরে। কিন্তু পরবর্তীদের কথা এর চেয়ে ভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর সঠিক পথের সন্ধান দিন। হায় যদি তাদের উল্লেখিত মতভেদের ক্ষতি তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত এবং তা অমুসলিম জাতিদের পর্যন্ত না গড়াতো! তবে বিপদ কিছুটা হলেও হালকা হত, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে তা তাদেরকে ছাড়িয়ে অন্যদের পর্যন্ত তথা বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের কাফিরদের পর্যন্ত অতিক্রম করেছে এবং তাদের অনৈক্য দ্বারা এদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখছে। উস্তায মুহাম্মদ আল গাযালী "যলামুন মিনাল গারব" ظلام من الغرب কিতাবের ২০০ পৃষ্ঠায় বলেন, আমেরিকার প্রেস্টন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে এক আলোচক একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন যেটি প্রায়ই প্রাচ্যবিদ এবং ইসলামী বিষয়াদি সম্পর্কে গুরুত্বদানকারী ব্যক্তিদের মাঝে আওড়ানো হচ্ছে, তিনি বলেন মুসলিমগণ কোন শিক্ষা নিয়ে বিশ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের উচিত হবে– যে ইসলামের দিকে তারা আহবান করছে তা নির্ণয় করা? তারা কি সুন্নীদের বুঝ সাপেক্ষ ইসলামী শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে? নাকি শিয়াহ্ তথা ইমামবাদী বা যায়দীয়াহ্দের বুঝ সাপেক্ষ ইসলামী শিক্ষা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে? এরপরে এরা ও তারা (শিয়াহ সুন্নীরা) প্রত্যেকেই আপোসে মতানৈক্যে ভুগছে। কোন সময় তাদের এক দল কোন বিষয়ে সীমাবদ্ধ প্রগতির চিন্তা করলে অপরদল পুরনো সংকীর্ণতামূলক চিন্তা করে।

সার কথা এই যে, ইসলামের প্রতি দাওয়াতদানকারীগণ দা'ওয়াতকৃত ব্যক্তিদেরকে অস্থিরতার ভিতরে ফেলে দেয়। কারণ তারা নিজেরাই অস্থিরতায় ভুগছে।[১]

---

[১] আমি বলব : গাযালীর শেষ দিনগুলোর অনেক লিখনী যেমন তার শেষের দিনগুলোতে প্রকাশিত কিতাব যার নাম «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» এ কথা প্রমাণ করেছে যে, তিনি নিজেই হচ্ছেন এমন দা'য়ীদের অন্তর্ভুক্ত যারা নিজেরাই অস্থিরতায় ভুগছেন। আমরা তাঁর এই অবস্থা পূর্ব থেকেই অনুভব করতাম– তার কিছু কথা ও তাঁর সাথে আমাদের কিছু ফিকহী বিষয়ে বিতর্ক এবং তার কোন কোন মস্তুরাজির কথা ও লিখনী থেকে যার মাধ্যমে তার এই অস্থিরতা ও সুন্নাহ্ থেকে পথভ্রষ্টতা এবং হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ে স্বীয় বিবেককে মাপকাঠি বানানোর প্রবণতা প্রকাশ পায়। তিনি এ ক্ষেত্রে হাদীছ শাস্ত্রের এবং তার উছুল (ব্যাকরণ) এর ধার ধারেন না। আর না তিনি এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হন। বরং যা তার কাছে ভাল লাগে তাই বিশুদ্ধ যদিও তা যঈফ হয়। আর যা তাঁর কাছে ভাল লাগে না সবার কাছে বিশুদ্ধ হলেও তার নিকট সেটা যঈফ হয়ে যায়। যেমন আপনি তা প্রকাশ্যেই দেখতে পাবেন আমার ভূমিকার উপর তাঁর মন্তব্যের মধ্যে, যে ভূমিকাটি আমি তার কিতাব فقه السيرة এর উপর আমার হাদীছের হাওয়ালা লিখার শুরুতে

আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান আল মা'ছূমীর হা-দীয়াতুস সুলতান ইলা মুসলিমী বিলাদি জাপান (هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان) পুস্তিকার ভূমিকায়

সংযুক্ত করেছিলাম যা চতুর্থ সংস্করণে ছাপানো হয়। এই কাজটি মূলত কোন আযহারী ভাই মারফত তাঁর পক্ষ থেকে প্রস্তাব ভিত্তিক ছিল। আমি সেদিন দ্রুত এই কাজে হাত দিয়েছিলাম এই মনে করে যে, এটা তাঁর পক্ষ থেকে সুন্নাহ ও নবী চরিত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদর্শন হবে এবং একে বহিরাগত বস্তুর অনুপ্রবেশ থেকে সংরক্ষিত রাখার আগ্রহই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এমনকি তিনি আমার হাওয়ালাকে প্রচার করেন এবং ইঙ্গিতকৃত মন্তব্যে তাঁর আনন্দের কথা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তার মন্তব্যের হেডিং হচ্ছে حول أحاديث هذا الكتاب এতদসত্ত্বেও তাতে তাঁর যঈফ হাদীছ গ্রহণের পদ্ধতি এবং কেবল বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করে বিশুদ্ধ হাদীছ পরিত্যাগ করার কথা আলোচনা করেন। তিনি এদ্বারা একথাই বুঝাতে চান যে, আমার জ্ঞান নির্ভর হাওয়ালা সংকলনের মত কাজের কোনই মূল্য তার কাছে নেই। যেহেতু তা এখন দৃষ্টিভঙ্গি খাটানোর স্থান যা একজন থেকে অপরজনের কাছে যথেষ্ট ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই যেটা এই ব্যক্তির কাছে গ্রহণীয় হবে সেটিই অপরজনের কাছে হবে বর্জনীয় এমনিভাবে এর বিপরীতের সাথে বিপরীত। এতে করে দীন অনুকরণীয় প্রবৃত্তিতে পরিণত হবে যেখানে ব্যক্তি বিশেষের চিন্তা ছাড়া-- কোন নিয়ম-নীতি থাকবে না যা সব মুসলিম মনীষীদের পরিপন্থী। তারা জানেন যে, সূত্র (সনদ) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সূত্র না থাকত তবে যে যা ইচ্ছা করত তাই বলত। কিন্তু গযালী উপরোক্ত কাজ করেছে (আল্লাহ একে হিদায়াত করুন) তার 'সীরাহ' গ্রন্থের অনেক হাদীছের ব্যাপারে। তাঁর কিতাবের বড় এক অংশ মুরসাল এবং মু'যাল হাদীছ দ্বারা ভরপুর। সেই সাথে এর যেগুলোতে সম্বন্ধ রয়েছে তাঁর মধ্যেও কিছু দুর্বল সূত্র রয়েছে যা শুদ্ধ নয়। যে কথা আমার হাওয়ালা সংকলনে দৃষ্টি নিক্ষেপকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সুষ্ঠুরূপে প্রতিভাত। এতদসত্ত্বেও উপরোক্ত শিরোনামে সানন্দে বলেছেন ঃ আমি সঠিক পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছি, আর সম্মানিত গ্রন্থরাজির উপর নির্ভর রেখেছি। আমি আমাকে এই ক্ষেত্রে সুন্দর এক অবস্থানে পৌঁছাতে পেরেছি বলে মনে করি, এতো হাদীছ জমা করেছি যাতে একজন সচেতন আলিমের অন্তর শান্ত হয়ে যাবে।

তিনি এমনটিই বলেছেন। তবে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনার গবেষণায় আপনি কোন নীতির অনুসরণ করেছেন– তাকি হাদীছ শাস্ত্রের মৌলনীতি যা নাবী চরিত্রের বিশুদ্ধ হাদীছের পরিচয় পাওয়ার একক উপায়? তবে তাঁর কাছে আপন ব্যক্তিগত চিন্তার উপর ভরসা করার কথা ছাড়া আর কোন উত্তর থাকবে না। যার মধ্যেকার ক্ষতি উল্লেখিত ইঙ্গিতে রয়েছে। একথার প্রমাণ হচ্ছে অশুদ্ধ সূত্রের হাদীছকে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সূত্রের হাদীছকে দুর্বল বলে দেয়া যদিও তা বুখারী-মুসলিমের হাদীছও হয়। যেমন আমি একটু পূর্বে ইঙ্গিতকৃত আমার ভূমিকায় তা বর্ণনা করেছি যা তিনি স্বীয় কিতাব فقه السيرة এর শুরুতে ছাপিয়েছিলেন (চতুর্থ সংস্করণ) কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, পরবর্তী মুদ্রণগুলোতে তা বাদ দিয়ে দেন। যেমন "দারুল আরক্বাম" দামেস্ক ও অন্যান্য মুদ্রণ। তাঁর এই আচরণ কিছু লোককে এই ধারণা পোষণে বাধ্য করেছে যে, তাঁর পূর্বের আবেদন কেবল সাধারণ পাঠকদের মধ্যে তার কিতাবকে প্রসিদ্ধি দান করার উদ্দেশে ছিল যেসব পাঠক সুন্নাহর সেবক ও তাঁর প্রতিরক্ষক এবং হাদীছের মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ পার্থক্যকারীদের শ্রমকে মূল্যায়ন করে– যারা এ কাজ করে

রয়েছে ঃ আমার কাছে জাপান দেশের মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন এসেছে তারা হচ্ছে প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে অবস্থিত "টোকিও" ও "ওসাকা" নগরীর লোক, যার সার কথা হচ্ছে ঃ ইসলাম ধর্মের হাকীকত (বাস্তবরূপ) কী? অতঃপর মাযহাব অর্থ কী? যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে তার উপর কি চার মাযহাবের যে কোন একটি গ্রহণ করা অপরিহার্য? অর্থাৎ তাকে কি মালিকী, হানাফী, শাফি'ঈ অথবা অন্য কোন মাজহাব অবলম্বী হতে হবে, নাকি না হলেও চলবে?

কারণ এখানে বিরাট মতানৈক্য ঘটেছে এবং ভয়ানক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে যখন জাপানের স্বচ্ছ চিন্তা ধারার কিছু লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে এবং ঈমানের মর্যাদায় মর্যাদাবান হতে ইচ্ছা পোষণ করে। যখন তারা "টোকিও"তে বিদ্যমান মুসলমানদের সংগঠনগুলোর কাছে তাদের মুসলিম হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে তখন ভারতবর্ষের একদল বলল ঃ তাদের উচিত ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অবলম্বন করা কেননা তিনি জাতির চেরাগ বা আলোকবর্তিকা। আবার ইন্দোনেশিয়ার "জাওয়া" এর একদল বলল ঃ (না তাদের) শাফি'ঈ হওয়া আবশ্যক। জাপানী লোকেরা তাদের কথা শুনে অতিশয় আশ্চর্যবোধ করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এভাবে মাযহাবের বিষয়টাই তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল।

তৃতীয় সংশয় ঃ আপনারা যে সুন্নাহ অনুসরণ এবং এর বিপরীতে ইমামদের কথা পরিত্যাগের দাওয়াত দেন তার অর্থ তাঁদের কথাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা এবং তাদের গবেষণা ও মতামত থেকে মোটেই উপকৃত না হওয়ার আহ্বান বলে মনে হয়। আমি বলব ঃ এই ধারণাটি সঠিকতার অনেক দূরে, বরং তা

জ্ঞানপূর্ণ নিয়মনীতি অনুযায়ী, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভিন্ন প্রবৃত্তির তাড়নায় নয় যেমন করেছেন গাযালী (আল্লাহ তাকে হিদায়াত দিন) তাঁর এই কিতাবে এবং শেষ কিতাবে যা হচ্ছে– السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث । তার এই আচরণ থেকে লোকজন পরিষ্কারভাবে জেনে গেছে যে, সে মু'তাযিলী লোক। তাঁর কাছে যুগ যুগ ধরে মুহাদ্দিছগণের হাদীছের সেবায় শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়ে কঠোর সাধনার কোনই মূল্য নেই, ঠিক তদ্রূপ ফকীহ ইমামগণের সাধনারও কোন মূল্য নেই– যারা মৌলনীতি নির্ধারণ করেন এবং এর উপর ভিত্তি করে শাখাগত বিষয়ে সমাধান বের করেন। কেননা তিনি এ থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করেন এবং যা ইচ্ছা বর্জন করেন তাদের কোন মৌলনীতি বা নিয়ম-নীতির সাথে মিল ছাড়াই।

অনেক গুণী জ্ঞানী আলিম (আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) তাঁর প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁর অস্থিরতা ও ভ্রান্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সর্বাধিক সুন্দর যে প্রতিবাদটি আমার চোখে পড়েছে তা আমার বন্ধু ডঃ রাবী' বিন হাদী আল-মাদখালীর আফগানী আল-মুজাহিদ পত্রিকা ছাপিয়েছে (৯-১১ সংখ্যা) এবং শ্রদ্ধেয় ভাই ছালিহ বিন আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ আ-লুশ শাইখ এর পুস্তিকা, যার নাম المعيار لعلم الغزالي ।

প্রকাশ্যভাবে বাত্বিল যেমনটি পূর্বোক্ত কথাগুলো থেকে প্রতিভাত হয়, কেননা সব কয়টি কথাই উক্ত ধারণার বিপরীত অর্থবহন করছে। আমরা যে বিষয়টির দিকে দাওয়াত দান করি তার সবই হচ্ছে এই যে, মাযহাবকে দীনরূপে গণ্য করা যাবে না এবং তাকে কুরআন ও হাদীছের স্থলে এমনভাবে আসন দেওয়া চলবে না যে, বিবাদ মিটানোর ক্ষেত্রে অথবা নবোদ্ভাবিত সমস্যার নতুন বিধান বের করার উদ্দেশ্যে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যেমন করে থাকে বর্তমান যুগের ফকীহরা। তারা শুদ্ধ অশুদ্ধ হক বাত্বিল জানার জন্যে কুরআন হাদীছের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়াই বিবাহ, তালাক ইত্যাদির নতুন বিধিবিধান প্রণয়ন করেছেন। আর এক্ষেত্রে তাদের ত্বরীকাহ (নীতি বা পথ) হচ্ছে اختلافهم رحمة অর্থ ঃ তাদের মতভেদ হচ্ছে রহমাত এবং সুযোগ ও সুবিধা– স্বার্থের অন্বেষণ। সুলাইমান তামীমী (রাহিমাহুল্লাহ) কতইনা সুন্দর বলেছেন ঃ

«إن أخذت برخصة كل عالم، اجتمع فيك الشر كله»

অর্থ ঃ তুমি যদি প্রত্যেক আলিমের প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ কর তবে সব অনিষ্ট তোমার মধ্যে একত্রিত হবে। ইবনু আব্দিল বর এটি বর্ণনা করে (২/৯১-৯২) বলেন, এটি সর্বসম্মত কথা। এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই। আমরা (উপরোক্ত নীতিরই) প্রতিবাদ করি যা সর্বসম্মত ব্যাপার যেমন আপনি দেখেছেন। আর তাঁদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তা থেকে উপকৃত হওয়া, বিতর্কিত যে সব বিষয়ে কুরআন হাদীছের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেগুলোর সঠিক অবস্থা বুঝতে সহযোগিতা নেওয়া অথবা যে সব বিষয় ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে তা বুঝতে যাওয়া এটাতো আমরা অস্বীকার করি না বরং এ ব্যাপারে নির্দেশ দান করি এবং উৎসাহ যোগাই, কারণ এ থেকে ঐ ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার আশা করা যায়– যে কুরআন হাদীছের হিদায়াত গ্রহণের পথ অবলম্বন করে।

আল্লামা ইবনু আব্দিল বর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন (২/১৭২) ঃ হে ভাই তোমার উপর মৌলনীতি মুখস্থ করা এবং তা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য। আর জেনে রাখুন, যে ব্যক্তি সুন্নাহ্ এবং কুরআনের স্পষ্ট বিধানগুলো সংরক্ষণ করেছে এবং ফকীহদের কথার ভিতর দৃষ্টি দিয়েছে এবং এটাকে তার গবেষণা কার্যের সহযোগী বিবেচনা করেছে এবং তাকে চিন্তা গবেষণার চাবিকাঠিরূপে গণ্য করেছে ও একাধিক অর্থ সম্ভাবনাময় হাদীছসমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেছে আর তাদের কোন একজনের এমনভাবে অন্ধ অনুসরণ করেনি যেরূপ করতে হয় হাদীছের ক্ষেত্রে, যার আনুগত্য সর্বাবস্থায় ও কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই ওয়াজিব, আর সে নিজেকে মুক্ত রাখেনি ঐ কাজ থেকে যে কাজে উলামাগণ নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তথা হাদীছ মুখস্থ করা ও তাতে চিন্তা নিবদ্ধ রাখা থেকে। বরং গবেষণা, বুঝা এবং চিন্তাভাবনায় তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ

করেছে এবং সর্বোপরি সে তাদের অবগতি দান ও অবহিত করানোর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়িত শ্রমের শুকরিয়া করেছে। তাঁদের প্রদত্ত সঠিক সিদ্ধান্ত-যার পরিমাণই বেশী রয়েছে এর উপর তাঁদের প্রশংসা করেছে, তাঁরা নিজেদেরকে যেমন ত্রুটি মুক্ত দাবী করেননি ঠিক তদ্রূপ তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত জ্ঞান করেনি, তবে সেই হবে ঐ বিদ্যান্বেষী যে পূর্বসুরী সৎ ব্যক্তিগণের আদর্শে অটল, তার অধিকার আদায়ে সার্থক, সঠিক পথ প্রদর্শিত, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের এবং তাঁর ছাহাবা (রাযিয়াল্লাহ আনহুম)-দের আদর্শের অনুসারী।

পক্ষান্তরে যে নিজেকে চিন্তা-গবেষণা থেকে দূরে রেখেছে এবং আমরা যা উল্লেখ করেছি তা থেকে বিমুখ রয়েছে এবং স্বীয় মতামত দ্বারা হাদীছের বিরোধিতা করেছে এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অন্যকে ঠেলে দিতে চায় সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অপরকে ভ্রষ্টকারী, আর যে ব্যক্তি এসবের কিছুই না জেনে বিদ্যাহীনভাবে ফতওয়াদানে প্রবৃত্ত হয় সে আরো কঠিন অন্ধ এবং আরো অধিক পথভ্রষ্ট।

কবি বলেন ঃ

فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق ※

অর্থ ঃ এটাই চির সত্য যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই, অতএব তুমি আমাকে নানারূপ পথ থেকে বাঁচতে দাও, স্পষ্ট পথসমূহ অবলম্বন করতে ছেড়ে দাও।

চতুর্থ সংশয় ঃ কিছু অন্ধ অনুসারীর নিকট একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যা তাদেরকে ঐসব হাদীছ অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখে মাযহাব যার বিপরীত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তাদের ধারণা যে, সুন্নাহ্‌র অনুসরণ করলে মাযহাবের ইমামগণকে ভুল প্রতিপন্ন করা অনিবার্য হয়। ভুল ধরার অর্থ তাদের নিকট ইমামদেরকে দোষারোপ করা আর যেখানে সাধারণ একজন মুসলিমকে দোষারোপ করা বৈধ নয় সেখানে তাদের মতো একজন ইমামকে কিভাবে দোষারোপ করা যাবে?

উত্তর এই যে, এ ব্যাখ্যা বাত্বিল। এর কারণই হচ্ছে হাদীছ অনুধাবন করা থেকে বিমুখতা, নচেৎ কিভাবে একজন বিবেকবান মুসলিম এরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারে? যেখানে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ হাকিম যদি গবেষণা করে কোন ফায়ছালা দেন এবং তাতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন তবে তাঁর জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে আর তিনি যদি গবেষণা করে ফয়ছালা দিয়ে তাতে ভুল করে ফেলেন তাহলে তার জন্যে একটি প্রতিদান রয়েছে।[১]

---

[১] বুখারী ও মুসলিম।

এ হাদীছই উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং পরিষ্কারভাবে একথা বলে দিচ্ছে যে, অমুক ব্যক্তি ভুল করেছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে এর অর্থ "অমুক ব্যক্তি একটি প্রতিদান পাবে"। এবার যে ব্যক্তি ভুল ধরল তার ক্ষেত্রে যখন সেই (ভুলকারী) ব্যক্তি প্রতিদান প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হল, তবে তার ভুল ধরার উপর কী করে এ ধারণা করা চলতে পারে যে, সে ঐ ব্যক্তিকে দোষারোপ করেছে? নিঃসন্দেহে এ ধারণা ভুল। যারাই এ ধারণা পোষণ করে তাদের জন্য এ ধারণা থেকে ফিরে আসা ওয়াজিব, নচেৎ সেই হবে মুসলিমদেরকে দোষারোপকারী। আর তা কোন এক সাধারণ ব্যক্তিকে নয় বরং মুসলিমদের বড় বড় ইমাম তথা ছাহাবা, তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন সহ অন্যান্যদেরকেও দোষারোপকারী হবে। কেননা আমাদের অবশ্যই জানা আছে যে, যখন এই মনীষীগণ একজন অপরজনের ভুল ধরতেন এবং তাদের একজন অপরজনের প্রতিবাদ জানাতেন[১] তবে কি কোন বিবেকবান একথা বলবে যে, তাদের একজন অপরজনকে দোষারোপ করতেন এবং বিশুদ্ধরূপে সাব্যস্ত হয়েছে যে, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জনৈক ব্যক্তির স্বপ্নের তা'বীর করলে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ভুল ধরে বলেছিলেন "তুমি কিছু সঠিক বলেছ আর কিছু ভুল বলেছ"।[২] তাহলে কি তিনি এর মাধ্যমে আবু বকরকে দোষারোপ করেছেন।

এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণকারীদের উপর এর আশ্চর্যজনক প্রভাব পড়েছে আর তা হচ্ছে এই যে, এ ধারণা তাদেরকে স্বীয় মাযহাব বিরোধী হাদীছ মানতে বাধা প্রদান করছে, কেননা তাঁদের নিকট এ ক্ষেত্রে হাদীছ মান্য করার অর্থ ইমামকে দোষারোপ করা, পক্ষান্তরে, হাদীছের বিরুদ্ধে হলেও ইমামকে অনুসরণ করায় রয়েছে তার সম্মান ও শ্রদ্ধা। তাই, তারা ধারণাকৃত দোষারোপ করা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে তার অন্ধ অনুসরণে অটল থাকে।

তারা অবশ্যই ভুলে গেছে (ভুলে যাওয়ার ভান করেছে বলব না) যে, তারা এই ধারণার মাধ্যমে এমন বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছে যা ঐ বিষয়ের তুলনায় আরো মারাত্মক যেটি থেকে তারা রেহাই পেতে চেয়েছিল। কারণ তাদেরকে যদি কেউ বলে ঃ অনুসরণ যখন অনুসরণীয় ব্যক্তির সম্মান বুঝায় এবং তার বিরুদ্ধাচরণ তাকে দোষারোপ করার নামান্তর হয় তবে আপনারা কিরূপে নিজের জন্যে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণকে বৈধ বিবেচনা করলেন, আর তাঁকে বাদ দিয়ে সুন্নাতের বিপরীতে মাযহাবের ইমামকে

---

[১] দেখুন ইমাম মুযানীর ইতিপূর্বে অতিবাহিত বক্তব্য (৪৪ পৃঃ) ও হাফিয ইবনু রাজাব' এর পূর্বোক্ত বক্তব্য (৩৫ পৃঃ)।

[২] বুখারী, মুসলিম হাদীছটির কারণ এবং তার অবস্থান জানার জন্য দেখুন الأحاديث الصحيحة (১২১ পৃঃ)

অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হলেন, যে ইমাম ভুলের উর্ধ্বে (নিষ্পাপ) নন, যাকে দোষারোপ করা কুফরীও নয়? আপনাদের নিকটে যখন ইমামের বিরুদ্ধাচরণ তাকে দোষারোপ করা বুঝায় তবে তো রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁকে দোষারোপ করার ব্যাপারে আরো স্পষ্ট বরং এটাই হচ্ছে প্রকৃত কুফরী (আল্লাহ হিফাজত করুন)। একথা যে কেউ বললেই তাদের কোন উত্তর থাকবে না শুধু একটি মাত্র বাক্য ছাড়া যা বহুকাল ধরে তাদের প্রায় লোকের কাছ থেকে শুনে আসছি। তা এই যে, **আমরা কেবল এজন্যই হাদীছ পরিত্যাগ করেছি যে, (আমাদের) মাযহাবের ইমাম বিশ্বস্ত এবং তিনি হাদীছ সম্পর্কে আমাদের তুলনায় অধিক জ্ঞাত।**

এ কথার আমাদের নিকট অনেকভাবে উত্তর রয়েছে যা উল্লেখ করতে গেলে ভূমিকাটি লম্বা হয়ে যাবে বিধায় একটি মাত্র উত্তর লিখখেই ক্ষান্ত হব, আল্লাহর ইচ্ছায় এটি হবে চূড়ান্ত মীমাংসা।

আমি বলি ঃ শুধু আপনাদের মাযহাবের ইমামই হাদীছ সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে বেশী ওয়াকিফহাল নন; বরং কয়েক দশক এমনকি শত শত ইমাম এমন রয়ে গেছেন যারা আপনাদের তুলনায় হাদীছ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তাই যখন বিশুদ্ধ হাদীছ আপনাদের মাযহাবের বিপরীতে চলে আসবে–যাকে এসব ইমামদের কেউ না কেউ গ্রহণ করেছেন, এই অবস্থায় এই হাদীছ গ্রহণ করা আপনাদের জন্য অপরিহার্য; কেননা আপনাদের উপরোক্ত কথা অর্থাৎ হাদীছের বিপরীতে ইমামের কথা গ্রহণ করার যুক্তি এখানে খাটবে না। কারণ আপনাদের প্রতিপক্ষ (তখন) অবশ্যই প্রতিবাদ করে বলবে ঃ আমরাওতো এই হাদীছ কেবল ঐ ইমামের প্রতি আস্থা থাকার ফলেই গ্রহণ করেছি যে ইমাম এটি গ্রহণ করেছেন। অতএব এই ইমামের অনুসরণ ঐ ইমামের অনুসরণ অপেক্ষা উত্তম যিনি হাদীছের বিপরীত করেছেন। ইনশাআল্লাহ তা'আলা যুক্তি স্পষ্ট, কারো পক্ষে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আর এজন্যই আমি বলতে পারি যে, আমার এই কিতাব যেহেতু নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত পদ্ধতির উপর সুসাব্যস্ত হাদীছ জমা করেছে, তাই এসবের উপর আমল পরিত্যাগ করার ব্যাপারে কারো কোন 'উযর খাটবে না। কারণ এতে এমন কোন হাদীছ নাই যা পরিত্যাগ করতে সব আলিমগণ এক মত হয়েছেন (আর এমন কাজ তারা করতেও পারেন না)। বস্তুত যে কোন বিষয়েই হাদীছ পাওয়া গেছে তাকে যে কোন একদল আলিম অবশ্যই গ্রহণ করেছেন, আর যিনি গ্রহণ করেননি তিনি হয় মাফ পেয়ে যাবেন আর না হয়

একটি প্রতিদান পাবেন। কেননা হয়তোবা তিনি এ বিষয়ে কোন দলীল পাননি অথবা পেয়েছেন কিন্তু এমন পদ্ধতিতে পৌছেছে যার মাধ্যমে তার মতে প্রমাণ সাব্যস্ত হয় না অথবা অন্য যে কোন 'উযরের ভিত্তিতে যা আলিমগণের কাছে পরিচিত। তবে যার কাছে ইমামের (মৃত্যুর) পরবর্তীতে দলীল সাব্যস্ত হয়ে যায়; তার ব্যাপারে ঐ ইমামের অন্ধ অনুসরণের কোন 'উযর খাটবে না বরং নির্ভুল দলীল মান্য করাই হবে ওয়াজিব। আর অত্র ভূমিকার মূল উদ্দেশ্য এটাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾

অর্থ ঃ হে মুমিন সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও এবং রাসূলের ডাকে, কেননা তা (সাড়া দান) তোমাদেরকে জীবন দান করবে। আর জেনে রাখ আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হন। বস্তুত তোমরা তাঁরই নিকট সমবেত হবে।[১]

আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেন, তিনিই পথের দিশা দেন, আর তিনি উত্তম অভিভাবক এবং উত্তম সাহায্যকারী।

হে আল্লাহ! মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও ছাহাবাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। প্রশংসা সবই বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্যে।

মুহাম্মদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী
দামেস্ক ২০/০৫/১৩৮১ হিজরী

[১] সূরা আল-আনফাল ২৪ আয়াত।

استقبال الكعبة
কাবামুখী হওয়া

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখনই ছলাতে দাঁড়াতেন তখন ফরয হোক আর নফল হোক উভয় অবস্থায়ই কা'বার দিকে মুখ করতেন।[১] এবং তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশও দিয়েছেন । তাইতো ছলাতে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে তিনি বলেন ঃ

«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر»

"যখন তুমি ছলাতে দাঁড়াবে, তখন পরিপূর্ণরূপে উযু করবে, অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে তাকবীর বলবে।"[২]

তিনি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে স্বীয় বাহনের উপর নফল ছলাত পড়তেন এবং তার উপরে বিত্‌রও পড়তেন, সে তাকে নিয়ে পূর্ব পশ্চিম যেদিকে মন সে দিকে নিয়ে যেত।[৩]

এ ব্যাপারেই আল্লাহর বাণী নাযিল হয় ঃ

﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾

অর্থ ঃ তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাওনা কেন সেখানেই আল্লাহর চেহারা বিদ্যমান।[৪] আবার (কখনও) স্বীয় উটনীর উপর নফল পড়তে চাইলে তাকে ক্বিবলামুখী করে তাকবীর বলতেন, অতঃপর সে যে দিকেই তাঁকে নিয়ে যেত সেদিকেই ছলাত পড়তেন।[৫]

"তিনি স্বীয় বাহনের উপর মাথার ইঙ্গিত দ্বারা রুকু ও সাজদাহ করতেন, সাজদাহকে রুকুর তুলনায় অধিক নিম্নমুখী করতেন।"[৬]

"ফরয ছলাত পড়ার ইচ্ছা করলে অবতরণ করে ক্বিবলামুখী হতেন।"[৭]

---

[১] এ বিষয়টি বহু সূত্রে অব্যাহত ধারায় চূড়ান্তরূপে জানাশুনা, বিধায় উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন; এ ছাড়া যে তথ্য আসছে তাতে এর নির্দেশ রয়েছে।

[২০৩] বুখারী, মুসলিম, সাররাজ। প্রথমটি الإرواء কিতাবে এসেছে (২৮৭)।

[৪] ইমাম মুসলিম এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে ছহীহ বলেছেন।

[৫] আবু দাউদ, ইবনু হিব্বান الثقات এর (১/১২) পৃষ্ঠায়, যিয়া المختارة তে হাসান সনদে এটা বর্ণনা করেছেন আর ইবনুস্‌ সাকান একে ছহীহ বলেছেন, ইবনুল মুলাক্কিনও خلاصة البدر المنير এর (১/২২) তে একে ছহীহ বলেছেন। আবার আব্দুল হক্ব আল ইশবীলী তাদের পূর্বেই তাঁর الأحكام কিতাবে ছহীহ বলে রেখেছেন যা আমার যাচাইকৃত মুদ্রণের (১৩৯৪নং হাদীছ) ইবনু হানী ইমাম আহমাদ থেকে তাঁর مسائل গ্রন্থের (১/৬৭) পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন তাতে ইমাম আহমাদের মতও এটাই।

[৬] আহমাদ, তিরমিযী; তিরমিযী একে ছহীহ বলেছেন।

[৭] বুখারী ও আহমাদ।

তবে মারাত্মক ভয়ভীতির সময় নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন যে, তারা স্বীয় পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায়, ক্বিবলামুখী হয়ে অথবা অন্যমুখী হয়ে ছলাত পড়তে পারবে।[১] তিনি আরো বলেছেন ঃ

«إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس»

অর্থ ঃ যখন তারা (দু'পক্ষ) সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন কেবল তাকবীর ও মস্তকের ইঙ্গিতই যথেষ্ট।[২]

তিনি আরো বলেন ঃ «ما بين المشرق والمغرب قبلة»

অর্থ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম এর মাঝেই ক্বিবলা রয়েছে।[৩]

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ "আমরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে কোন সফর বা জিহাদী কাফেলায় ছিলাম। অতঃপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে আমরা ক্বিবলা নিয়ে মতানৈক্যে পড়ে যাই। প্রত্যেকে পৃথকভাবে ছলাত আদায় করি এবং ছলাতের অবস্থান জানার জন্য আমাদের একেকজন নিজের সম্মুখে দাগ কেটে রাখে। পরক্ষণে যখন প্রভাত হল তখন দাগ দেখলাম তাতে প্রমাণিত হল যে, আমরা ক্বিবলা ভুল করে অন্যদিকে ছলাত পড়েছি। আমরা এ ঘটনা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানালাম, (তিনি আমাদেরকে পুনরায় ছলাত পড়তে বলেননি) বরং বললেন ঃ (তোমাদের ছলাত যথেষ্ট হয়েছে)"।[৪]

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (কাবাকে সামনে রেখে) বাইতুল মাক্বদিসের দিকে ছলাত পড়তেন যে পর্যন্ত এই আয়াত অবতীর্ণ হয়নি ঃ

﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

অর্থ ঃ অবশ্যই (হে নবী) আমি তোমার মুখমণ্ডলকে আকাশ পানে বারবার ফিরাতে দেখছি, আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাকে তোমার পছন্দনীয় ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব। অতএব, তোমার মুখমণ্ডলকে মাসজিদুল হারামের অভিমুখে ফিরিয়ে দাও।[৫]

---

[১] বুখারী ও মুসলিম। এ হাদীছটি الإرواء ৫৮৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।

[২] বুখারী ও মুসলিমের সনদে বাইহাক্বী।

[৩] তিরমিযী, হাকিম; তারা উভয়ে একে ছহীহ বলেছেন। আমি মানারুস্ সাবীল কিতাবের (تخريج তাখরীজ) বা হাদীছ যাচাইমূলক উদ্ধৃতি গ্রন্থ إرواء الغليل এর ২৯২ নং হাদীছে উল্লেখ করেছি।

[৪] দারাকুতনী, হাকিম, বায়হাক্বী, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে এর সাক্ষ্য মূলক বর্ণনা রয়েছে, অপর আরেক সাক্ষ্য ত্বাবরানীতে রয়েছে الإرواء ২৯৬।

[৫] সূরা আল-বাক্বারা ১৪৪ আয়াত।

যখন এ আয়াত নাযিল হল তখন তিনি কাবামুখী হয়ে গেলেন। ক্বুবাবাসীরা মসজিদে ফজরের ছলাত আদায়রত ছিল এমতাবস্থায় হঠাৎ এক আগন্তুক এসে বলল ঃ আল্লাহর রাসূলের উপর গত রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তাঁকে কাবামুখী হওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরাও তার দিকে মুখ ফিরাও। তাদের মুখগুলো তখন সিরিয়ার দিকে ছিল। খবর শ্রবণান্তে তারা সবাই ঘুরে গেল আর ইমামই তাদেরকে নিয়ে (বর্তমান) ক্বিবলার দিকে ঘুরেছিলেন।[১]

القيام
ক্বিয়াম বা দাঁড়ানো

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফরয ও নফল ছলাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর অনুসরণে ঃ

﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় ভরে দাঁড়াও।[২]

তবে সফরে নফল ছলাত তিনি বাহনের উপর পড়তেন এবং স্বীয় উম্মতের জন্য প্রচণ্ড ভীতির সময় পায়ে হাঁটা অথবা আরোহী অবস্থায় ছলাত পড়ার রীতি রেখে যান। যেমনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। আর তা হচ্ছে আল্লাহর এ বাণী অবলম্বনে–

﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾

অর্থ ঃ তোমরা ছলাতসমূহ, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছলাত[৩] পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালন কর এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয় সহকারে দাঁড়াও, যদি ভীতিগ্রস্ত হও তবে পদব্রজে অথবা আরোহী অবস্থায় (ছলাত পড়)। অতঃপর যখন নিরাপদ হও তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা (আগে) জানতে না।[৪]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুর রোগকালীন অবস্থায় বসে

---

[১] বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, আস্‌সাররাজ ও ত্বাবরানী (৩/১০৮/২), ইবনু সা'দ (১/২৪৩), এটা الإرواء (২৯০) রয়েছে।

[২] সূরা আল-বাকারাহ ২৩৮ আয়াত।

[৩] অধিকাংশ উলামার বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে ছলাতটি হচ্ছে আছরের ছলাত। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর সাথীদ্বয়, এ বিষয়ে অনেক হাদীছ রয়েছে। হাফিয ইবনু কাছীর এগুলোকে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[৪] সূরা আল-বাকারাহ ২৩৮-২৩৯ আয়াত।

ছলাত আদায় করেছেন।[১]

ইতিপূর্বেও তিনি যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন আরো একবার বসে ছলাত আদায় করেন। লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছলাত পড়ছিল তিনি তাদেরকে ইঙ্গিতে বললেন বস, তখন তারা সবাই বসে যায়। ছলাত শেষ করে বললেন ঃ

«إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلاتفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (أجمعون)»

কিছুক্ষণ পূর্বে তোমরা পারস্য ও রোম সম্প্রদায়ের কাজ করতে শুরু করেছিলে। তারা তাদের রাজা-বাদশাদেরকে উপবিষ্ট অবস্থায় রেখে নিজেরা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা এমনটি করো না। ইমামকে কেবল অনুকরণের জন্যই নিয়োগ করা হয়। তাই তিনি যখন রুকু করেন তখন তোমরা রুকু কর, আর তিনি যখন মাথা উঠান তখন তোমরাও মাথা উঠাও, তিনি যখন বসে ছলাত আদায় করেন তখন তোমরা সবাই বসে ছলাত আদায় কর।[২]

صلاة المريض جالسا
পীড়িত ব্যক্তির বসে ছলাত আদায়

'ইমরান বিন হুছাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আমি অর্শ[৩] রোগে আক্রান্ত ছিলাম, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ

«صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب»

"দাঁড়িয়ে ছলাত পড়, যদি তা না পার তবে বসে পড়বে। যদি তাও না পার তবে কাত হয়ে দেহের পার্শ্বদেশের ভরে শুয়ে পড়বে।[৪]

তিনি আরো বলেন ঃ আমি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বসে ছলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন ঃ

«من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما

---

[১] তিরমিযী একে বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন, আহমাদও এটি বর্ণনা করেন।

[২] বুখারী, মুসলিম; এটি আমার কিতাব إرواء الغليل এর ৩৯৪নং হাদীছের আওতায় উদ্ধৃত হয়েছে।

[৩] যে শব্দ দ্বারা অর্শরোগ বুঝানো হয়েছে তাকে এক বচনে باسور বলা হয়। শেষের অক্ষর তখন হবে ر রা। এর অর্থ নিতম্বের অভ্যন্তরীণ ফোড়া বিশেষ। আবার একে باسون ও বলা হয়, শেষের অক্ষর নুন সহকারে যার অর্থ এমন ফোড়া বিশেষ যাতে দূষিত রক্ত থাকা পর্যন্ত আরোগ্য লাভ হয় না। (ফতহুল বারী)

[৪] বুখারী, আবু দাউদ ও আহমাদ।

(وفي رواية : مضطجعا) فله نصف أجر القاعد »

যে কোন ব্যক্তির দাঁড়িয়ে ছলাত পড়াই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছলাত পড়বে সে দাঁড়িয়ে ছলাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে, আর যে শুয়ে (অপর বর্ণনায় পার্শ্ব দেশের উপর) ছলাত পড়বে সে বসে ছলাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে।[১]

এ হাদীছে পীড়িত ব্যক্তির কথাই বুঝানো হয়েছে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

خرج رسول الله ﷺ على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال : «إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم »

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদল লোকের নিকট গমন করে দেখলেন তারা অসুস্থতার দরুণ বসে ছলাত পড়ছে। এদেখে তিনি বললেন– বসে ছলাত আদায়কারীর ছওয়াব দাঁড়িয়ে ছলাত আদায়কারীর অর্ধেক।[২]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক পীড়িত ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে গিয়ে তাকে বালিশের উপর ছলাত আদায় করতে দেখে তিনি তা টেনে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি একখণ্ড কাঠ[৩] নিলেন এর উপর ছলাত পড়ার জন্য। তিনি তাও টেনে নিয়ে ফেলে দেন এবং বলেন ঃ যদি সম্ভব হয় তবে মাটির উপর ছলাত পড়বে তা না হলে ইশারা করে পড়বে এবং সাজদাকে রুকু অপেক্ষা বেশী নিচু করবে।[৪]

---

[১] বুখারী, আবূ দাউদ ও আহমাদ। ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন ঃ ইমরান (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীছ দ্বারা ঐ পীড়িত ফরয আদায়কারী ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে কষ্ট করে হলেও দাঁড়াতে পারে। এমতাবস্থায় বসা ব্যক্তির ছওয়াব দাড়ানো ব্যক্তির ছওয়াব অপেক্ষা অর্ধেক করা হয়েছে তাকে দাঁড়ানোর প্রতি প্রেরণা দান করার উদ্দেশ্যে যদিও (এ অবস্থায়) বসা জাইয রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজর ফতহুল বারীতে বলেছেন (২/৪৬৮) ঃ এটি যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা।

[২] আহমাদ ও ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ।

[৩] "লিসানুল আরব" অভিধানে রয়েছে, (উদ) কাঠ বলতে চিকন কাঠ বুঝায়। আবার এও বলা হয়েছে যে, যে কোন বৃক্ষের কাঠ চাই তা চিকন হোক বা মোটা হোক। আমি বলবো ঃ হাদীছ দ্বিতীয় অর্থকেই সমর্থন করে। কেননা প্রথম অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করা দুর্বোধ্য হবে।

[৪] ত্বাবরানী, বায্যার, ইবনুস্ সাম্মাক স্বীয় হাদীছ গ্রন্থে (২/৬৭) বাইহাক্বী, এর সনদ ছহীহ যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি "ছহীহা" (৬২৩ হাঃ)।

الصلاة في السفينة
নৌযানে ছলাত

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নৌযানে ছলাত আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ، ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা না করলে তার উপর দাঁড়িয়ে ছলাত আদায় করবে।[১]

বয়স বেশী হলে ও বার্ধক্যে উপনীত হলে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার ছলাতের স্থানে স্তম্ভ বানিয়ে নেন যার উপর তিনি ভর দিতেন।[২]

القيام والقعود في صلاة الليل
রাত্রিকালীন ছলাতে দাঁড়ানো ও বসা

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘরাত ধরে দাঁড়িয়ে আবার কখনও দীর্ঘরাত ধরে বসে ছলাত পড়তেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে ক্বিরা'আত পড়তেন তখন দাঁড়িয়ে রুকু করতেন আর যখন বসে ক্বির'আত পড়তেন তখন বসে রুকু করতেন।[৩]

তিনি কখনও বসে ছলাত আদায়কালে যখন বসে ক্বিরা'আত পড়তেন তখন ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত অবশিষ্ট থাকতে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় সেগুলো পড়ে রুকুতে যেতেন ও সাজদা করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় রাক্'আতেও এ রকম করতেন।[৪]

তিনি কেবল বৃদ্ধ হলেই শেষ বয়সে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে বসে নফল ছলাত পড়েছেন।[৫]

তিনি আসন পেতে (চারজানু হয়ে) ছলাতে বসতেন অর্থাৎ ডান পায়ের তলা বাম উরুর নীচে ও বাম পায়ের তলা ডান উরুর নীচে করে বসতেন।[৬]

---

(১) বাযযার (৬৮) দারাকুত্বনী, আব্দুল গনী আল মাক্বদিসী "সুনান" এর (২/৮২) পৃষ্ঠায় হাকিম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। **(ফায়েদাহ)** : বিমানে ছলাত পড়ার বিধান নৌযানে ছলাত পড়ার মতই। যদি সম্ভব হয় তবে দাঁড়িয়ে ছলাত পড়বে, তা না হলে বসেই ইশারার মাধ্যমে রুকু সাজদা করে পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতি অনুযায়ী ছলাত পড়বে।

(২) আবূ দাউদ, হাকিম, তিনি ও যাহাবী একে ছহীহ বলেছেন। আমি একে "ছহীহা" (৩১৯) ও "ইরওয়া" এর (৩৮৩) নং হাদীছে উদ্ধৃত করেছি।

(৩) মুসলিম ও আবু দাউদ।

(৪) বুখারী ও মুসলিম।

(৫) মুসলিম ও আহমাদ।

(৬) নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ স্বীয় "ছহীহ" এর (১/১০৭/২) আব্দুল গনী আল মাক্বদিসী "আস্ সুনান" এর (১/৮০) ও হাকিম, তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

الصلاة في النعال والأمر بها

জুতা পরে ছলাত ও তার আদেশ

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনও খালি পায়ে দাঁড়াতেন আবার কখনও জুতা পরে দাঁড়াতেন।[১] আর উম্মতের জন্য এটা বৈধ রেখেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ছলাত পড়বে তখন সে যেন স্বীয় জুতা জোড়া পরে নেয়, অথবা খুলে নিয়ে স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যভাগে রেখে দেয়, সে দু'টির দ্বারা যেন অপরকে কষ্ট না দেয়।[২]

কখনও জুতা পরে ছলাত আদায়ের উপর জোর (তাগিদ) দিয়ে বলেছেন ঃ

« خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم »

তোমরা ইয়াহুদদের বিরোধিতা কর কেননা তারা জুতা এবং মোজা পরে ছলাত পড়ে না।[৩]

কখনও ছলাতাবস্থাতেই স্বীয় পদযুগল থেকে জুতা জোড়া খুলে ছলাত চালিয়ে যেতেন।

যেমন আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন ঃ

আমাদেরকে নিয়ে একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাত পড়েছিলেন, ছলাতের এক পর্যায়ে তিনি স্বীয় জুতা জোড়া খুলে তাঁর বাম পার্শ্বে রেখে দিলেন। এ দেখে লোকজনও তাদের জুতা খুলে ফেলল, তিনি ছলাত সম্পন্ন করে বললেন ঃ তোমাদের কী হল যে, তোমরা জুতা খুলে রেখে দিলে? তারা বলল ঃ আমরা আপনাকে জুতাদ্বয় খুলে রাখতে দেখেছি তাই আমরাও আমাদের জুতাগুলো খুলে ফেলেছি।

তিনি বললেন ঃ জিবরীল এসে আমাকে বললেন, জুতায় ময়লা (অথবা বললেন ঃ কষ্টদায়ক বস্তু) (অপর বর্ণনায় অপবিত্র বস্তু) রয়েছে। তাই আমি জুতাদ্বয় খুলে ফেলেছি। অতএব তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসবে তখন সে যেন স্বীয় জুতাদ্বয়ের প্রতি লক্ষ করে, তাতে যদি ময়লা (অথবা বললেন ঃ কষ্টদায়ক বস্তু) (অপর বর্ণনায় অপবিত্র বস্তু) দেখে তবে যেন জুতাদ্বয়কে মুছে

---

[১] আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ। হাদীছটি মুতাওয়াতির যেমন ইমাম ত্বাহাবী উল্লেখ করেছেন।

[২৩৩] আবু দাউদ, বায্যার (স্বীয় যাওয়াইদে ৫৩) হাকিম একে ছহীহ্ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

নেয় এবং তা পরিধান করে ছলাত পড়ে।[১]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জুতাদ্বয় খুলতেন তখন তাঁর বাম পার্শ্বে রাখতেন।[২] তিনি বলতেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ছলাত পড়বে তখন স্বীয় জুতাদ্বয় যেন তার ডান পার্শ্বে না রাখে। আর অন্যের ডানে হলে বাম পার্শ্বেও না রাখে তবে বাম পার্শ্বে কেউ না থাকলে সে পার্শ্বেই রাখবে। অন্যথায় জুতাদ্বয় স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যস্থানে রাখবে।[৩]

الصلاة على المنبر

মিম্বরের উপর ছলাত

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা মিম্বরের উপর ছলাত পড়েন (অপর বর্ণনায় এটি ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট)[৪] তিনি এর উপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহু আকবার বললেন, লোকেরাও তাঁর পিছনে আল্লাহু আকবার বলল। তখনও তিনি মিম্বরে অবস্থানরত [অতঃপর মিম্বরের উপরেই রুকু করালেন] তারপর সোজা হয়ে পিছনে সরে অবতরণ করলেন এবং মিম্বরের পাদদেশে সাজদাহ করলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করলেন [এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে প্রথম রাক্‌আতের ন্যায় আমল করলেন] শেষ পর্যন্ত ছলাত সম্পন্ন করে লোকজনের দিকে মুখ করে বললেন ঃ

«يا أيها الناس! إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»

হে লোক সমাজ! আমি এমনটি এজন্য করেছি যেন তোমরা আমার অনুকরণ করতে পার এবং আমার ছলাত শিখতে পার।[৫]

(১ও৩)আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমা, হাকিম; তিনি একে ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী ও নববী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। প্রথম হাদীছটি «الإرواء» -তে উদ্ধৃত হয়েছে (২৮৪ নং হাঃ)।

(২)আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু খুযাইমা (১/১১০/২) ছহীহ সনদে।

(৪) মিম্বরের ক্ষেত্রে এই তিন স্তর হওয়াই সুন্নাত, এর চেয়ে বেশী নয়। বেশী করা হচ্ছে উমাইয়াদের কর্তৃক প্রবর্তিত বিদআত যা অনেক ক্ষেত্রে ছফ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আবার এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে অথবা মিহরাবে রাখা এটি আরেকটি বিদআত। এমনিভাবে একে দক্ষিণ দেয়ালে উঁচু করে বারান্দার মত বানানো যাতে প্রাচীর ঘেরা সিড়ি দিয়ে উঠতে হয় (এটিও বিদআত)। বস্তুত সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ। দেখুন "ফাতহুল বারী" (২/৩৩১)।

(৫) বুখারী ও মুসলিম এবং অপর বর্ণনাটিও মুসলিমের, ইবনু সা'দ (১/২৫৩)। এটি "ইরওয়া"তে উদ্ধৃত হয়েছে (৫৪৫)।

السترة ووجوبها

সুতরা বা আড়াল ও তার ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুতরার নিকটবর্তী হয়ে (ছলাতে) দাঁড়াতেন। তাঁর ও দেয়ালের মধ্যে তিন হাতের ব্যবধান থাকত।[১] তাঁর সাজদার স্থান ও দেয়ালের মধ্যে একটি বকরী অতিক্রম করার মত ব্যবধান থাকত।[২] তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন ঃ

« لا تصل إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين »

সুতরা ব্যতীত ছলাত পড়বে না, আর তোমার সম্মুখ দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দিবে না, যদি সে অগ্রাহ্য করে তবে তার সাথে লড়াই করবে, কেননা তার সাথে ক্বারীন (শয়ত্বান) রয়েছে।[৩]

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলতেন ঃ

« إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته »

তোমাদের কেউ যখন সুতরার অভিমুখে ছলাত পড়তে দাঁড়ায় তখন যেন তার নিকটবর্তী হয় (যাতে) শয়ত্বান তার ছলাত বিনষ্ট না করতে পারে।[৪]

কোন কোন সময় তিনি তাঁর মসজিদে অবস্থিত স্তম্ভের নিকট ছলাত পড়ার চেষ্টা করতেন।[৫]

---

[১] বুখারী ও আহমাদ।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

[৩] ইবনু খুযাইমা স্বীয় "ছহীহ" গ্রন্থে (১/৯৩/১) উত্তম সনদে।

[৪] আবু দাউদ, বায্যার (৫৪ পৃঃ যাওয়াইদ) হাকিম; তিনি একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ও নববী তার সমর্থন দিয়েছেন।

[৫] আমি বলি ঃ ইমাম ও একাকী উভয়ের ক্ষেত্রেই সুতরা জরুরী। যদিও তা বিশাল মসজিদে হয়। ইবনু হানী ইমাম আহমাদ থেকে স্বীয় মাসা-ইল গ্রন্থে বলেন (১/৬৬)ঃ "আমাকে আবু আব্দিল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম আহমাদ) একদা আমার সম্মুখে সুতরাবিহীন অবস্থায় ছলাত পড়তে দেখেন, আমি তার সাথে জামে মসজিদে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ কোন কিছু দিয়ে আড়াল ক,র আমি একটি লোক দ্বারা আড়াল করলাম।"

আমি বলব ঃ এ ঘটনায় এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইমাম সাহেবের মতে সুতরার বেলায় বড় মসজিদ আর ছোট মসজিদের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। আর এটাই হক্ব কথা। অথচ যতগুলো দেশ ভ্রমণ করেছি তাতে দেখেছি অধিকাংশ ইমাম ও মুছল্লীগণ এ বিষয়ে ত্রুটি করেন। ঐসব দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, যা ভ্রমণে প্রথম বারের মত সুযোগ হয়েছিল ১৪১০ হিজরী রাজাব মাসে। তাই আলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হবে লোকজনকে এ বিষয়ে অবগত করা, তাদেরকে উৎসাহ দান করা এবং তাদেরকে এর বিধান বর্ণনা করা। আর এ বিধান দুই হারামকেও (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনার মসজিদকেও) শামিল করে।

তিনি যখন [মরু ভূমিতে ছলাত পড়তেন যেখানে সুতরা (আড়াল) করার কিছুই নেই] তখন তাঁর সামনে একটি বর্শা গেড়ে তার দিকে ছলাত পড়তেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে (ছলাত পড়তে) থাকত।[১] আবার কখনো তিনি আড়াআড়িভাবে স্বীয় বাহনকে রেখে ওর দিকে ছলাত আদায় করতেন।[২]

এটা উট রাখার স্থানে ছলাত পড়ার বিধানের বিপরীত।[৩] কেননা সেখানে ছলাত পড়তে তিনি নিষেধ করেছেন।[৪]

কখনো বা বাহন ধরে তাকে সোজা করে তার পিছনের কাঠ খণ্ডের দিকে ছলাত পড়তেন।[৫] তিনি বলতেন ঃ

«إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك»

তোমাদের কেউ যখন বাহনের পিছনের কাঠখণ্ড সদৃশ কোন বস্তু সামনে রাখে তখন এর পিছন দিক দিয়ে কে অতিক্রম করে এর পরোয়া না করে নিঃসঙ্কোচে তার দিকে মুখ করে ছলাত আদায় করবে।[৬]

একবার তিনি একটি বৃক্ষের দিকে মুখ করে ছলাত পড়েছেন।[৭] কখনোবা তিনি খাট (পালঙ্ক) এর দিকে মুখ করে ছলাত পড়তেন অথচ আইশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার উপর কাৎ হয়ে (স্বীয় চাদরের নীচে) শুয়ে থাকতেন।[৮]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর এবং সুতরার মধ্য দিয়ে কোন বস্তুকে অতিক্রম করতে দিতেন না। এক সময় তিনি ছলাত পড়তে ছিলেন হঠাৎ একটি ছাগল তার সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। তিনি তার সাথে পাল্লা দিয়ে তার পেটকে দেয়ালে লাগিয়ে দিলেন (ফলে সে তাঁর পিছন দিয়ে অতিক্রম করে)।[৯]

কোন এক ফরয ছলাত পড়াকালীন অবস্থায় স্বীয় হাত জড় করে ফেললেন যখন ছলাত শেষ করলেন ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ছলাতে কি কিছু ঘটেছে? তিনি বললেন, না, তবে শয়ত্বান আমার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে চেয়েছিল তাই আমি তার গলা চেপে ধরেছিলাম এমনকি আমি তার

---

[১] বুখারী, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ।
[২] বুখারী ও আহমাদ।
[৩] বুখারী ও আহমাদ।
[৪] অর্থাৎ উটের বাসস্থান ও গোয়ালে।
[৫] মুসলিম, ইবনু খুযাইমাহ (২/৯২) ও আহমাদ।
[৬] মুসলিম ও আবু দাউদ।
[৭] নাসাঈ ও আহমাদ, ছহীহ সনদে।
[৮] বুখারী, মুসলিম, আবু ইয়ালা (৩/১১০৭) আল-মাকতাবুল ইসলামী ফটোস্ট্যাট কপি।
[৯] ইবনু খুযাইমা স্বীয় "ছহীহ" (১/৯৫/১) এবং ত্বাবারানী (৩/১৪০/৩) এবং হাকিম তিনি একে ছহীহ বলেছেন আর যাহাবী তার সমর্থন দিয়েছেন।

জিহ্বার শীতলতা আমার হাতে অনুভব করেছি। আল্লাহর শপথ তার ব্যাপারে যদি আমার ভাই সুলাইমান (আঃ) আমাকে অতিক্রম না করতেন (অর্থাৎ জ্বিন-শয়তান আয়ত্ত্ব করার ক্ষমতা শুধু তাকে দেয়া হোক এ মর্মে দু'আ না করতেন) তবে তাকে মসজিদের কোন খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হত এমনকি মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। [সুতরাং যে ব্যক্তির ক্বিবলা ও তার মধ্যে কেউ অন্তরায় না হোক এ ব্যাপারে ক্ষমতা রাখে সে যেন তা করে]।[১]

তিনি বলেছেন ঃ

وإذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره (وليدرأ ما استطاع) (وفي رواية : فليمنعه مرتين) فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ۔

তোমাদের কেউ যখন এমন বস্তুর দিকে মুখ করে ছলাত পড়ে যা তাকে লোকজন থেকে আড়াল করে এরপরও কেউ যদি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তবে যেন তার বক্ষ ধরে তাকে প্রতিহত করে, [এবং সাধ্যমত তাকে বাধা প্রদান করে] অপর বর্ণনায় ঃ তাকে যেন দু'বার বাধা দেয়, তাও যদি সে অমান্য করে তবে যেন তার সাথে লড়াই করে কেননা সে হচ্ছে শয়তান।[২]

---

[১] আহমাদ, দারাকুত্বনী ও ত্বাবরানী ছহীহ সনদে। এই হাদীছের মর্ম বুখারী, মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে একদল ছাহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটি সেই সব অসংখ্য হাদীছের একটি যেগুলোকে ক্বাদিয়ানীরা অস্বীকার করে। কেননা তারা কুরআন সুন্নাহয় উল্লেখিত জ্বিন (দানব) জগৎকে বিশ্বাস করে না। কুরআন হাদীছের বাণী প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাদের কৌশল সবারই জানা। যদি কুরআনের বাণী হয় তবে তার অর্থ পরিবর্তন করে ফেলে যেমন আল্লাহর বাণী ﴿قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن﴾ অর্থ ঃ বলো (হে নবী!) আমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল (কুরআন) শ্রবণ করেছে। তারা বলে জিন অর্থ মানব। তারা "জিনকে" "ইনস" এর সমার্থবোধক গণ্য করে যেমন "বাশার" শব্দ "ইনস" এর অর্থ দেয়। এ ধরনের অর্থ করার মাধ্যমে তারা অভিধান এবং শরীয়াত থেকে বেরিয়ে আছে। আর যদি তা (দলীল) হাদীছ হয় তাহলে অপব্যাখ্যা দ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব হলে তাই করে। আর তা না হলে একে বাত্বিল বলে দেয়া তাদের নিকট অতি সহজ ব্যাপার– যদিও হাদীছ শাস্ত্রের সব ইমাম এবং তাঁদের সাথে উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি এর ছহীহ হওয়ার উপর বরং মুতাওয়াতির হওয়ার উপর একমত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিন।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

তিনি বলতেন ঃ

«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه»

ছলাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কী পরিমাণ (গুনাহ্) রয়েছে তবে চল্লিশ (বৎসর) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা তার পক্ষে উত্তম (মনে) হত।[১]

مايقطع الصلاة

যা ছলাত ভঙ্গ করে

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ

«يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل : المرأة (الحائض) والحمار والكلب الأسود قال أبو ذر : قلت يارسول الله! مابال الأسود من الأحمر؟ فقال : الكلب الأسود شيطان»

কোন ব্যক্তির সম্মুখে বাহনের পিছনের কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় কিছু (সুতরা) না থাকলে (সাবালিকা) মহিলা[২], গাধা ও কাল কুকুরের অতিক্রমণ তার ছলাত ভঙ্গ করে ফেলে।

আবু যর বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, লাল কুকুর ও কাল কুকুরের মধ্যে ব্যবধান হল কেন? তিনি বললেন ঃ "কাল কুকুর হচ্ছে শাইত্বান।"[৩]

الصلاة تجاه القبر

ক্ববরের দিকে ছলাত (এর বিধান)

তিনি ক্ববরের দিকে মুখ করে ছলাত পড়তে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন ঃ «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» তোমরা ক্ববরের দিকে (মুখ করে) ছলাত পড়বে না এবং তার উপর বসবেও না।[৪]

---

(১) বুখারী, মুসলিম ও ইবনু খুযাইমাহ্ (১/৯৪/১)।

(২) (الحائض) শব্দ দ্বারা সাবালিকা মহিলা উদ্দেশ্য। আর ছালাত ভঙ্গ বলতে বাত্বিল হওয়া উদ্দেশ্য; পক্ষান্তরে لا يقطع الصلاة شيء অর্থ ঃ কোন কিছুই ছালাত ভঙ্গ করেনা উক্ত হাদীছটি দুর্বল, আমি تمام المنة কিতাবের ৩০৬ পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য কিতাবে এর তথ্য তুলে ধরেছি।

(৩ ও ৪) মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ (১/৯৫/২), আরো দেখুন আমার স্বরচিত أحكام الجنائز وبدعها ও تحذير الساجد من اتخاذ القبور المساجد গ্রন্থদ্বয়।

النية
নিয়ত প্রসঙ্গ[১]

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন ঃ

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»

অর্থ ঃ আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে যা সে নিয়ত করবে।[২]

التكبير
তাকবীর প্রসঙ্গ

অতঃপর তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) الله أكبر (আল্লাহু আকবার) বলে ছলাত শুরু করতেন।[৩] ছলাতে ক্রটিকারীকেও তিনি এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে এবং তাকে আরো বলেছিলেন ঃ

---

[১] ইমাম নববী روضة الطالبين (১/২২৪)এ বলেন ঃ নিয়ত অর্থ ইচ্ছা করা। তাই মুছাল্লী স্বীয় অন্তরে ছলাত ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন যহর, ফরয ইত্যাদি উপস্থিত করবে অতঃপর মনে মনে প্রথম তাকবীর (তাকবীর তাহরীমাহ)-এর সাথে সংযুক্ত করবে ঐসব বিষয়ের সংকল্পকে।

{প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন সমাজে মুছাল্লায় দাঁড়িয়ে মুছাল্লাহর দু'আ হিসাব "ইন্নী অজ্জাহতু...." পাঠ করা হয়। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছলাত আদায়ের পদ্ধতিতে তাকবীরের পূর্বে এ দু'আ পাঠের কোন নিয়ম নেই। অতএব, ইহা নাবীর তরীকা বহির্ভূত নবাবিষ্কৃত বিদ'আত। হাঁ তবে ছহীহ হাদীছসমূহে শুরুর (ছানার) বহু দু'আর মধ্যে অজ্জাহ্তু অজহিয়া... এ দু'আটি রয়েছে যা তাকবীরের পরে পাঠযোগ্য, পূর্বে নয়। দেখুন আবু দাউদ ও তিরমিযী। অনুরূপভাবে তাকবীরের পূর্বে বা যে কোন আমল ও ইবাদতের পূর্বে জনৈক মৌলভী সাহেবদের রচিত গদবাধা আরবী বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে নিয়ত পড়ার যে প্রচলন দেখা যায় যেমন "নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া...... আতাওয়াজ্জাহা.... ইত্যাদিও দ্বীনের ভিতর নতুন আবিষ্কৃত বিদআত। প্রচলিত নিয়ত পড়ার নিয়ম কুরআন হাদীছে নেই। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ছাহাবাগণ, তাবিঈগণ, চারজন ইমামসহ ইমসলামে নির্ভরযোগ্য কোন আলিম পড়েননি। অনুরূপভাবে ইমামের "আনা ইমামুল লিমান হাযারা অমান ইয়াহ্যুর" বলাও নবাবিষ্কৃত বিদ'আত। মূলতঃ নিয়ত বলতে ও পড়তে হয় না। নিয়ত করতে হয়।} (সম্পাদক)

[২] বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি। হাদীছটি الإرواء তে উদ্ধৃত হয়েছে (২২)।

[৩] মুসলিম ও ইবনু মাজাহ। হাদীছে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি ঐসব লোকদের ন্যায় শুরু করতেন না যারা বলে, "নাওয়াইতু আন উছাললিয়া" বরং এটি হচ্ছে সর্বসম্মত বিদ'আত। কেবল তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, বিদ'আতটা ভাল ধরনের (হাসানাহ) না খারাপ (সাইয়িআহ) ধরনের। আমরা বলতে চাই ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাধারণ বাণী হচ্ছে وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই ..... জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়।

«إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر»

কারো ছলাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে ঠিক মত ওযু করবে, অতঃপর الله أكبر (আল্লাহু আকবার) বলবে।[১] তিনি আরো বলতেন:

«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»

ছলাতের চাবি পবিত্রতা অর্জন (ওযু) আর তাকবীর দ্বারা ছলাতের ভিতর (এর অসংশ্লিষ্ট আল্লাহ ও তদীয় নাবী কর্তৃক) নিষিদ্ধ কাজগুলো হারাম হয়ে যায়[২] এবং সালাম দ্বারা তা হালাল হয়ে যায়।[৩]

তিনি তাকবীর বলা কালে স্বর উঁচু করতেন যাতে তাঁর পিছনের মুক্তাদীরা শুনতে পায়।[৪]

তিনি অসুস্থ হলে আবু বকর তাঁর স্বর উঁচু করে মুক্তাদীদের কাছে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাকবীর পৌঁছিয়ে দিতেন।[৫] তিনি বলতেন– ইমাম যখন الله أكبر (আল্লাহু আকবার) বলেন তখন তোমরাও (আল্লাহু আকবার) বল।[৬]

رفع اليدين

হস্ত উত্তোলন প্রসঙ্গ

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোন সময় তাকবীর বলার সাথে হস্ত উত্তোলন করতেন।[৭] আবার কখনো বা তাকবীরের পরে[৮] আবার কখনো

---

[১] ত্বাবরানী বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণনা করেছেন।

[২] হারাম বলতে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা উদ্দেশ্য এবং হালাল বলতে ছলাতের বাহিরে যে সব কাজ হালাল তা-ই উদ্দেশ্য। তাহলীল ও তাহরীম মুহাল্লিল (হালালকারী) ও মুহাররিম (হারামকারী) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীছটি যেমন এ কথা বুঝাচ্ছে যে, ছলাতে (প্রবেশের) দ্বার রুদ্ধ, কোন বান্দাহ ওযু ব্যতীত তা খুলতে পারবে না, অনুরূপভাবে হাদীছটি এ কথার প্রতি নির্দেশ করছে যে, ছলাতের নিষিদ্ধতার গণ্ডিতে প্রবেশ করা তাকবীর ছাড়া অন্য কোন কাজ দ্বারা হবে না। আর সালাম ব্যতীত অন্য কোন কাজ দ্বারা তা থেকে বাহির হওয়া চলবে না। এটা অধিকাংশ আলিমদের অভিমত। (কিন্তু হানাফী মাযহাবে ঐ সবই জায়িয বরং সালামের পরিবর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে বায়ু নিঃসরণের মাধ্যমে ছলাত সমাপ্ত করা যায়।)

[৩] আবু দাউদ, তিরমিযী এবং হাকিম একে বর্ণনা করে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সমর্থন দিয়েছেন। হাদীছটি ইরওয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে (৩০১)।

[৪] আহমাদ, হাকিম; তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সমর্থন দিয়েছেন।

[৫] মুসলিম ও নাসাঈ।

[৬] আহমাদ ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে।

[৭ ও ৮] বুখারী ও নাসাঈ।

বা তাকবীরের পূর্বে[১] হস্ত উত্তোলন করতেন।

"তিনি অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত অবস্থায় দু'হাত উত্তোলন করতেন। তবে আঙ্গুলসমূহের মাঝে ফাঁক করতেন না এবং একেবারে মিলাতেনও না][২] হস্তদ্বয়কে স্বীয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন।[৩] আবার কখনো বা কানের লতি বরাবর উঠাতেন।[৪]

وضع اليمنى على اليسرى والأمر به
বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার নির্দেশ

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন।[৫] আর বলতেন ঃ

«إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة»

আমরা নবীদের দল ইফতার অবিলম্বে করতে, সাহুর বিলম্বে খেতে এবং ছালাতে ডান হাতের উপর বাম হাত রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।[৬]

«مر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى»

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, সে তার ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে ছলাত আদায় করছিল, তিনি তার হাত ছাড়িয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন।[৭]

وضعهما على الصدر
বুকের উপর হাত রাখা

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর ডান হাত রাখতেন।[৮] এ বিষয়ে স্বীয় ছাহাবাগণকেও আদেশ প্রদান

---

(১) বুখারী ও আবু দাউদ।
(২) আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ (১/৬২/২ ও ৬৪/১) তামামুল মিন্নাহ এবং হাকিম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তার সমর্থন দিয়েছেন।
(৩) বুখারী ও নাসাঈ।
(৪) বুখারী ও আবু দাউদ।
(৫) মুসলিম ও আবু দাউদ; এটি الإرواء তেও উদ্ধৃত হয়েছে (৩৫২)।
(৬) ইবনু হিব্বান ও যিয়া ছহীহ সনদে।
(৭) আহমাদ ও আবু দাউদ ছহীহ সনদে।
(৮) আবু দাউদ, নাসাঈ (১/৫৪/২) ছহীহ সনদ, আর ইবনু হিব্বানও ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন (৪৮৫)।

ধরেছেন।[১] তিনি কখনো ডান হাত দ্বারা বাম হাত আঁকড়ে ধরতেন।[২] তিনি হস্তদ্বয়কে বুকের উপর রাখতেন।[৩] তিনি ছলাতে কোমরে[৪] হাত রাখতে নিষেধ করতেন।[৫] এটা মেরুদণ্ডে (হাত রাখায়) গণ্য যা থেকে তিনি নিষেধ করতেন।[৬]

---

[১] মালিক, বুখারী ও আবু আওয়ানাহ্।

[২] নাসাঈ, দারাকুত্বনী, ছহীহ্ সনদ সহকারে। এ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, হাত বাঁধা সুন্নাত। আর প্রথম হাদীছ প্রমাণ করছে যে, হাত রাখা সুন্নাত। অতএব উভয়টাই সুন্নাত। কিন্তু হাত বাঁধা ও হাত রাখার মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে গিয়ে পরবর্তী হানাফী আলিমগণ যে পদ্ধতি পছন্দ করেছেন তা হচ্ছে বিদআত; যার রূপ তারা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আঁকড়ে ধরবে এবং অপর তিন অঙ্গুলি বিছিয়ে রাখবে (ইবনু আবিদীন কর্তৃক দুররে মুখতারের টীকা (১/৪৫৪)। অতএব হে পাঠক! পরবর্তীদের (মনগড়া) এ কথা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে।

[৩] আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ স্বীয় ছহীহ্ গ্রন্থে (১/৫৪/২) আহমাদ, আবুশ্ শাইখ স্বীয় "তারীখু আছবাহান" গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১২৫) ইমাম তিরমিযীর একটি সনদকে হাসান বলেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে এর বক্তব্য মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালিক এবং বুখারীতে পাওয়া যাবে। এ হাদীছের বিভিন্ন বর্ণনাসূত্র নিয়ে আমি أحكام الجنائز কিতাবের (১১৮) পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

জ্ঞাতব্য ঃ বুকের উপর হাত রাখাটাই ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। এছাড়া অন্য কোথাও রাখার হাদীছ হয় দুর্বল, আর না হয় ভিত্তিহীন। এই সুন্নাতের উপর ইমাম ইসহাক বিন রাহভিয়া আমল করেছেন। মারওয়াযী المسائل গ্রন্থে ২২২ পৃষ্ঠাতে বলেন, ইসহাক আমাদেরকে নিয়ে বিত্‌রের ছলাত পড়তেন এবং তিনি কুনূতে হাত উঠাতেন আর রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তেন। তিনি বক্ষদেশের উপরে বা নীচে হাত রাখতেন। কাযী 'ইয়াযও الإعلام কিতাবের ১৫ পৃষ্ঠায় (রিবাত্ব তৃতীয় সংস্করণ) এ مستحبات الصلاة ছলাতের মুস্তাহাব কাজ বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুরূপ কথা বলেছেন, ডান হাতকে বাম হাতের পৃষ্ঠের উপর বুকে রাখা। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আহমাদের বক্তব্যও এর কাছাকাছি, তিনি তার المسائل এর ৬২ পৃষ্ঠায় বলেন ঃ আমার পিতাকে দেখেছি যখন তিনি ছলাত পড়তেন তখন তার এক হাতকে অপর হাতের উপর বুকের উপরস্থলে রাখতেন দেখুন إرواء الغليل (৩৫৩)।

[৪] এটা হচ্ছে কোমরের উপর হাত রাখা যেমন কোন কোন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন।

[৫] বুখারী ও মুসলিম আর এটি الإرواء গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে (৩৭৪)।

[৬] আবু দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্যগণ।

النظر إلى موضع السجود والخشوع
সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা ও একাগ্রতা

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাত অবস্থায় মাথা নীচু করে যমীনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[১] তিনি যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন তখন থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি সাজদার স্থানচ্যুত হয়নি।[২]

তিনি বলেন ঃ

«لاينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي»

ঘরে এমন কোন বস্তু থাকা উচিত নয় যা মুছাল্লীকে অন্যমনস্ক করতে পারে।[৩]

তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠাতে নিষেধ করতেন।[৪] এমনকি এ বিষয়ে তাকিদ দিয়ে বলেছেন–

«لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لاترجع إليهم (وفي رواية : أو لتخطفن أبصارهم)»

যারা ছলাতাবস্থায় আকাশের দিকে তাকায় তারা যেন এথেকে বিরত হয় অন্যথায় তাদের চক্ষু ফিরে পাবে না। অপর বর্ণনানুযায়ী তাদের চক্ষু কেড়ে নেয়া হবে।[৫]

অন্য হাদীছে রয়েছে ঃ

«فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»

তোমরা যখন ছলাত পড়বে তখন এদিক সেদিক তাকাবে না, কেননা বান্দাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এদিক সেদিক না তাকায় ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর

(১ও২) বাইহাক্বী, হাকিম-এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন আর তা যথার্থই। প্রথম হাদীছের পক্ষে দশজন ছাহাবীর হাদীছ সাক্ষ্য বহন করে যা ইবনু আসাকির বর্ণনা করেছেন (১৭/২০২/২) আরো দেখুন الإرواء কিতাবে (৩৫৪)।

জ্ঞাতব্য ঃ এই হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, যমীনে সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা সুন্নাত। অতএব কিছু সংখ্যক মুছল্লী যারা চক্ষু বন্ধ করে ছলাত পড়ে, এ হচ্ছে ঠাণ্ডা পরহেযগারী। বস্তুতঃ মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম)-এর আদর্শই হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ।

(৩) ছহীহ সনদে আবু দাউদ ও আহমাদ। এটি صحيح أبي داود গ্রন্থে রয়েছে (১৭৭১) হাদীছে উল্লেখিত البيت তথা ঘর শব্দ দ্বারা কা'বা ঘর বুঝানো উদ্দেশ্য। যেমন হাদীছের প্রেক্ষাপট নির্দেশ করছে।

(৪) বুখারী, আবু দাউদ।

(৫) বুখারী, মুসলিম ও সাররাজ।

চেহারাকে বান্দার চেহারার প্রতি নিবদ্ধ রাখেন।[১] তিনি এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে বলেন ঃ «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» এ হচ্ছে বান্দাহর ছলাতে শয়তানের ছিনতাই।[২]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাহর ছলাতাবস্থায় তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন যতক্ষণ সে এদিক-ওদিক না তাকায়। তাই যখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন আল্লাহও তার থেকে বিমুখ হয়ে যান।[৩]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনটি কাজ নিষেধ করেছেন ঃ মোরগের মতো ঠোকর দেয়া, কুকুরের মত বসা ও শিয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকানো।[৪]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন ঃ চির বিদায় গ্রহণকারীর ন্যায় ছলাত পড় যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছ আর যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।[৫]

তিনি আরো বলেন ঃ ফরয ছলাতের সময় উপস্থিত হলে যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে তার জন্য ওযু করে এবং সুন্দরভাবে তার একাগ্রতা ও রুকু (ইত্যাদি) পালন করে সেই ছলাত তার পূর্বেকৃত (ছাগীরা) গুনাহসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ না কাবীরা গুনাহ করবে। আর এ ধারা সারা জীবন চলতে থাকবে।[৬]

একদা তিনি রেখা অঙ্কিত একটি পশমী কাপড়ে ছলাত আদায় করেন, এর ফলে একবার তার রেখাগুলোর প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়। অতঃপর ছলাত শেষে বললেন, আমার এই কাপড়টি আবু জাহম এর নিকট নিয়ে যাও এবং তার রেখাবিহীন মোটা কাপড়টি নিয়ে আস। কেননা এইমাত্র কাপড়টি আমার ছলাতে বিঘ্নতা সৃষ্টি করেছে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমি ছালাতাবস্থায় তার রেখার দিকে দৃষ্টি দেয়ার ফলে এটি আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলার উপক্রম হয়েছিল।[৭]

---

(১) তিরমিযী, হাকিম, তারা উভয়ই একে ছহীহ বলেছেন "صحيح الترغيب" (৩৫৩)।

(২) বুখারী ও আবু দাউদ।

(৩) আবু দাউদ ও অন্যান্যগণ, একে ইবনু হিব্বান ও ইবনু খুযাইমা ছহীহ বলেছেন। "ছহীহ আত্তারগীব" (৫৫৫)।

(৪) আহমাদ, আবূ ইয়ালা "সহীহ আত্তারগীব" (৫৫৬)।

(৫) আল মুখাল্লাছ ফী আহাদীছ মুনতাক্বাহ, ত্বাবরানী, রুয়ানী, যিয়া "আল মুখতারাহ" ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু আসাকির ফকীহ হাইসামী "আসনাল মাত্বা-লিব" গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন।

(৬) মুসলিম

(৭) বুখারী, মুসলিম ও মালিক, এটি উদ্ধৃত হয়েছে আল-ইরওয়াতে (৩৭৬)।

'আইশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর একটি কাপড়ে ছবি ছিল সে কাপড়টি سهوة ছোট্ট কামরা[১] পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দিকে মুখ করে ছলাত পড়ছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন একে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে ফেল? কেননা এ ছবিগুলো ছলাতের ভিতর আমার সামনে ভেসে উঠে।[২]

তিনি আরো বলতেন ঃ খাবারের উপস্থিতিতে কোন ছলাত নেই, আর নেই মলমূত্রের চাপের অবস্থায়।[৩]

أدعية الاستفتاح
ছলাতের শুরুতে পঠিতব্য দু'আ

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন দু'আ দ্বারা ছলাত শুরু করতেন। এর মধ্যে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, মাহাত্ম্য ও গুণকীর্তন করতেন। তিনি এ ব্যাপারে ছলাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

«لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر، ويحمد الله عزوجل ويثني عليه، ويقرأ بما تيسر من القرآن....»

কোন ব্যক্তির ছলাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে "আল্লাহু আকবার" বলবে এবং আল্লাহর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে এবং কুরআন থেকে সহজসাধ্য অংশ পড়বে।[৪]

তিনি একেক সময় একেক দু'আ পড়তেন। দু'আগুলো হচ্ছে ঃ

১। «اللَّهُمَّ! بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ!

---

(১) سهوة বলা হয় যমীনের সামান্য ঢালু অবস্থানে অবস্থিত ছোট্ট ঘরকে যা সামগ্রী ভাণ্ডার ও গুদাম সদৃশ "নিহায়াহ"।

(২) বুখারী, মুসলিম, আবু 'আওয়ানাহ্। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ছবিগুলোকে ছিঁড়ে ফেলা ও নস্যাৎ করার আদেশ না দিয়ে কেবল সরিয়ে নিতে বলার কারণ এই যে, এগুলো প্রাণীর ছবি ছিল না। (আল্লাহই অধিক জ্ঞাত)। বুখারী ও মুসলিমের বিভিন্ন বর্ণনায় অন্যান্য ছবি নস্যাৎ করে ফেলার কথা এসেছে। বিস্তারিত জানার জন্য "ফাতহুল বারী" (১০/৩২১) ও "গাইয়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীছিল হালালি ওয়াল হারাম" (১৩১-১৪৫নং) হাদীছের পর্যালোচনা দ্রষ্টব্য।

(৩) বুখারী ও মুসলিম।

(৪) আবু দাউদ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ»

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপের মধ্যে এই পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি কর, যে পরিমাণ দূরত্ব রেখেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে; হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন কর যেভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপকে পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত কর।" নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটি ফরয ছলাতে পড়তেন।[১]

২। «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (مُسْلِمًا) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اَللّٰهُمَّ! أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، (سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ) أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ (وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ) أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ (لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ) تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

অর্থ ঃ আমি একনিষ্ঠ অনুগত মুসলিম হিসাবে স্বীয় মুখমণ্ডলকে ঐ সত্তার সম্মুখীন করলাম যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। অবশ্যই আমার ছলাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি এজন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি

---

[১] বুখারী, মুসলিম, দ্বিতীয় হাদীছটি ইবনু আবী শাইবাহ (১২/১১০) পৃষ্ঠাতে রয়েছে, এটি الإرواء গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে (৮)।

[২] অধিকাংশ বর্ণনাতে এরূপই আছে। কোন কোন বর্ণনাতে আছে وأنا من المسلمين আমি মুসলিমদের মধ্যে গণ্য। বাহ্যত এটা কোন বর্ণনাকারীর হেরফের। এর প্রমাণও এসেছে। অতএব মুছল্লীর وأنا أول المسلمين (আমি মুসলিমদের প্রথমজন) বলাই উচিত। আর এটা বলাতে কোন অসুবিধাও নেই। পক্ষান্তরে কেউ কেউ ধারণা করে যে, উক্ত আয়াতের অর্থ সমস্ত মানুষ এ গুণ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি সর্বপ্রথম এ গুণে গুণান্বিত হচ্ছি। বাস্তবে এমনটি নয়। বরং তার অর্থ তিনি (আল্লাহ) যা আদেশ দিয়েছেন তা পালনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়া। এ সাদৃশ্য আয়াত قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين বলুন যদি রহমানের সন্তান থাকতো তাহলে আমি ইবাদতকারীদের প্রথমজন। মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন ঃ وأنا أول المؤمنين আর আমি মু'মিনদের প্রথম জন।

আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম জন।[২] হে আল্লাহ তুমি রাজ্যাধিপতি তুমি ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই। আমি প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি। তুমি আমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার দাস বা বান্দা।[১] আমি স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি, অতএব তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। তুমি ব্যতীত আর কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারবে না। তুমি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের সন্ধান দাও কেননা তুমি ব্যতীত আর কেউই এর সন্ধান দিতে পারে না এবং আমার অসচ্চরিত্র অপসারণ কর। কেননা তুমি ব্যতীত আর কেউ তা সরাতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে অটল এবং তোমার হুকুম ও দ্বীনের সর্বদা সহযোগী।[২] সকল কল্যাণ তোমার দুই হাতে, মন্দ বিষয় তোমার দিকে সম্বন্ধযোগ্য নয়।[৩] হিদায়াতপ্রাপ্ত কেবল সেই যাকে তুমি হিদায়াত দান কর। আমি তোমার কারণেই আছি ও তোমার নিকটই প্রত্যাবর্তিত হব। তোমার থেকে পরিত্রাণের স্থান ও আশ্রয়স্থল কেবল তোমার কাছেই রয়েছে। তুমি বরকতময় ও সুউচ্চ। তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি ও তাওবাহ করছি।

পূর্বোক্ত দু'আটি তিনি ফরয ও নফল উভয় ছলাতেই পড়তেন।[৪]

---

(১) আমি তোমার বান্দা বা দাস অর্থ আমি আর কারো দাসত্ব করিনা বা করব না। এটা বলেছেন আযহারী।

(২) اى انا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة আমি তোমার আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত– প্রতিষ্ঠিতর পর প্রতিষ্ঠিত। لب بالمقام থেকে অর্থাৎ যখন কোন জায়গায় অবস্থান নেয়। وسعديك তোমার নির্দেশের সহযোগিতার পর সহযোগিতা এবং সন্তুষ্টিপূর্ণ দ্বীনের নিয়মিত অনুসরণের পর অনুসরণ। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকা।

(৩) আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ও সম্বন্ধ নেই। ইবনুল কাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন : আল্লাহ্ পাক ভাল মন্দের সৃষ্টিকর্তা তাই তাঁর কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে মন্দত্ব থাকতে পারে কিন্তু তাঁর চরিত্র ও কাজের মধ্যে তা নেই। তাইতো আল্লাহ পাক যুলম থেকে মুক্ত যে যুলমের মর্ম হচ্ছে বস্তুকে অপাত্রে রাখা তাই তিনি কোন বস্তুকে তার যোগ্য পাত্র ছাড়া কোথাও রাখেন না এহেন কাজের সবটুকুই ভাল। আর মন্দ হচ্ছে বস্তুকে অপাত্রে রাখা অতএব যোগ্য পাত্রে রাখলে আদৌ সে মন্দ হবে না। জানা গেল যে, মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ্ দায়ী নন। (তিনি বলেন) : যদি তুমি বল– তাহলে তিনি মন্দকে কেন সৃষ্টি করলেন? আমি বলব, তাঁর সৃষ্টি ও কার্য-সম্পাদন ভাল কেননা সৃষ্টি ও কার্য সম্পাদন তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ। পক্ষান্তরে মন্দের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ও গুণান্বিত নন। আর সৃষ্টির মধ্যে যা মন্দ রয়েছে এত কেবল এজন্যই মন্দ যে আল্লাহ্ থেকে সে সম্পর্কচ্যুত পক্ষান্তরে কাজ ও সৃষ্টি তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সে জন্যই সে ভাল। এ বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য ইবনুল কাইয়িমের شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل ‹‹ (১৭৮-২০৬) দ্রষ্টব্য।

(৪) মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, আহমাদ, শাফি'ঈ, ত্বাবারানী। অতএব যে ব্যক্তি এই দু'আকে নফল ছলাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছে সে ভুল ধারণা করেছে।

৩। পূর্বোক্ত দু'আটাই তবে أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ শব্দ থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত বাদ যাবে এবং এর পূর্বের অংশটুকু থাকবে।[১]

৪। পূর্বোক্ত দু'আর وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ এরপর এটুকু বৃদ্ধি করবে ঃ

«اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِيْ سَيِّئَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ لَا يَقِيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে সর্বোত্তম চরিত্র ও সর্বোত্তম আমলের পথ প্রদর্শন কর; তুমি ছাড়া এর সর্বোত্তম পথ প্রদর্শন অন্য কেউ করতে পারে না। আর আমাকে মন্দ চরিত্র ও মন্দ কাজ থেকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া অন্য কেউ এর মন্দ থেকে রক্ষা করতে পারে না।[২]

৫। «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা জড়িত পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি, তোমার নাম অনেক বরকতমণ্ডিত হোক, তোমার মহানত্ব সমুন্নত হোক। আর তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই।[৩]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কথা হচ্ছে ঃ ....سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ অর্থাৎ উপরোক্ত দু'আটি।[৪]

৬। উপরোক্ত দু'আটিই (সুবহানাকা....) তবে তাহাজ্জুদের ছলাতে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) তিনবার ও اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) তিনবার বর্ধিত করতেন।[৫]

---

[১] বিশুদ্ধ সনদে নাসাঈ।

[২] বিশুদ্ধ সনদে নাসাঈ ও দারাকুত্বনী।

[৩] سبحانك অর্থ أسبحك تسبيحا অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমাকে সর্ব প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি। وبحمدك অর্থাৎ আমরা তোমার প্রশংসায় নিযুক্ত রয়েছি। ...وتبارك অর্থ ঃ তোমার নামের বরকত (কল্যাণ) বৃদ্ধি পাক, এজন্য যেই তোমার নাম স্মরণ করেছে সে সকল কল্যাণ লাভ করেছে। جدك অর্থ ঃ তোমার সম্মান ও মহানত্ব উঁচু হোক।

[৪] আবু দাউদ ও হাকিম এবং তিনি একে বিশুদ্ধ বলেছেন এবং যাহাবী এতে একমত পোষণ করেছেন। উক্বাইলী বলেছেন (পৃঃ ১০৩) এই হাদীছ বিভিন্ন সূত্রে উত্তম সনদসমূহ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে, এটি الإرواء (৩৪১) পৃষ্ঠাতে উদ্ধৃত হয়েছে।

[৫] ইবনু মান্দাহ তার التوحيد গ্রন্থে (২/১২৩) বিশুদ্ধ সনদে, নাসাঈ عمل اليوم والليلة মাউকূফ ও মারফু সনদে جامع المسانيد এ ইবনু কাসীর (৩/২/২৩৫/২) পরবর্তীতে নাসাঈতেই তা আমার দৃষ্টিগোচর হয় (নং ৮৪৯ ও ৮৫০) তাই আমি الصحيحة এর (২৯৩৯) হাদীছটি উদ্ধৃত করেছি।

৭। اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ،

অর্থ ঃ আল্লাহই প্রকৃতপক্ষে সবচাইতে বড় এবং তাঁর জন্য অনেক প্রশংসা, আমি সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি।

ছাহাবাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি এই দু'আ দ্বারা ছলাত শুরু করলে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ আমি এ শব্দগুলোর জন্য আশ্চর্য হয়েছি, কারণ (এগুলোর) জন্য আসমানের দ্বারগুলো খোলা হয়েছিল।[1]

৮। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ،

আল্লাহর জন্য অনেক প্রশংসা যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ।

এই দু'আ দ্বারা অন্য এক ব্যক্তি ছলাত শুরু করলে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ আমি বারজন ফেরেশতাকে দেখেছি তাঁরা এই মর্মে প্রতিযোগিতা করছেন যে, কে কার পূর্বে এই দু'আ নিয়ে উঠবেন।[2]

৯। اَللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلٰهِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ ،

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, তুমি আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যারা রয়েছে তাদের আলো।[3] তোমার জন্যে সমস্ত প্রশংসা তুমি আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যারা আছে তাদের রক্ষক।[4] তোমার জন্যে সমস্ত প্রশংসা, তুমি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যারা আছে তাদের মালিক। সব প্রশংসা তোমার, তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য, তোমার কথা সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, ক্বিয়ামত সত্য,

---

[1] মুসলিম, আবু আওয়ানা, তিরমিযী একে ছহীহ বলেছেন, আবু নুআইম একে أخبار أصبهان (১/২১০) কিতাবে জুবাইর ইবনু মুত্বইম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নফল ছলাতে তা পড়তে শুনেছেন।

[2] মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ।

[3] আলো বলতে আলো দানকারী যার মাধ্যমে সবাই পথের সন্ধান পেয়ে থাকে।

[4] রক্ষক বলতে আসমান যমীনের রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধায়ক।

নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তোমার উপরই ভরসা রাখি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমার পক্ষে বিতর্ক করি। তোমার কাছেই মীমাংসা চাই। তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমার নিকটেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমার পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দাও, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা কর। আমার অপেক্ষা তুমি যা অধিক জানো তাও ক্ষমা করে দাও, তুমি অগ্রগণ্যকারী, তুমিই পশ্চাদপদকারী, তুমি আমার মাবুদ তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই। তুমি ব্যতীত কোন উপায় ও ক্ষমতা নেই।[১]

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দু'আটি নফল ছলাতে পড়তেন যেমন পরবর্তী দু'আগুলোও নফল ছলাতে পড়তেন।[২]

১০। اَللّٰهُمَّ! رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ،

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আলাইহিমুস্ সালাম)-এর প্রভু আসমান যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যমান বস্তুর জ্ঞানের অধিকারী তুমি স্বীয় বান্দাদের মতভেদকৃত বিষয়ে ফায়সালা করে থাক। তোমার অনুমোদনক্রমে মতভেদকৃত বিষয়ে সত্যের পথে আমাকে পরিচালিত কর। তুমি যাকে চাও সঠিক পথ দেখিয়ে থাক।[৩]

১১। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম– দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আল-হামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও দশবার আসতাগফিরুল্লাহ পাঠ করতেন অতঃপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (وَعَافِنِيْ) ،

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, হিদায়াত দাও, জীবিকা দান কর এবং সুস্থতা দাও।

এই দু'আও দশবার বলতেনঃ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ ،

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট বিচার দিবসের সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[৪]

---

[১] বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানা, আবু দাউদ, ইবনু নছর ও দারিমী।

[২] এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে, ফরয ছলাতে তা পড়া যাবে না। এটা স্পষ্ট কথা, তবে ইমাম– মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ করে তা পড়বেন না।

[৩] মুসলিম ও আবু আওয়ানাহ।

[৪] আহমাদ, ইবনু আবী শাইবাহ (১২/১১৯/২) আবু দাউদ, ত্বাবারানী الأوسط (৬২/২) ও الصغير এর সমন্বিত গ্রন্থে একটি ছহীহ সনদে ও অপরটি হাসান সনদে।

১২। الله أكبر তিনবার, অতঃপর বলতেন ঃ ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ ،

অর্থ ঃ রাজত্ব, অসীম ক্ষমতা, বড়ত্ব, মহত্ব, অহঙ্কারের মালিক।[১]

القراءة

ক্বিরা'আত প্রসঙ্গ

প্রারম্ভিক দু'আ পাঠান্তে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইভাবে শয়ত্বান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ،

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়ত্বানের পাগলামী[২] অহঙ্কারী ও কু-কাব্যের প্ররোচনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি[৩]। তিনি কখনও একটু বৃদ্ধি সহকারে বলতেন ঃ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ......

অর্থ ঃ আমি সর্বশ্রোতা আল্লাহর নিকট শয়ত্বান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি.....।[৪]

অতঃপর নীরবে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ পড়তেন।[৫]

القراءة آية آية

প্রতি আয়াতকে পৃথক পৃথক ভাবে পাঠ করা

অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়তেন প্রতি আয়াতে থেমে থেমে। যেমন بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বলে থামতেন। অতঃপর الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে থামতেন। অতঃপর الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ বলে থামতেন। অতঃপর বলতেন مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

---

(১) ছহীহ সনদে আবু দাউদ ও ত্বায়ালিসী।

(২) همزه : কোন রাবী এর ব্যাখ্যা করেছেন الموتة বলে, মীম অক্ষরে দম্মাহ ও 'তা' অক্ষরে ফাতহার সাথে; এক প্রকার পাগলামি। ونفخه ঃ বর্ণনাকারী এর ব্যাখ্যা করেছেন "অহঙ্কার" বলে। نفثه ঃ বর্ণনাকারী এর ব্যাখ্যায় বলেছেন "কবিতা"। এ তিনটি ব্যাখ্যা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে ছহীহ ও মুরসাল সনদ দ্বারা মারফু'ভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। এখানে কবিতা দ্বারা মন্দ কবিতা উদ্দেশ্য। কারণ নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন কতক কবিতা প্রজ্ঞাবহ। এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।

(৩) আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুত্বনী, হাকিম এবং তিনিসহ ইবনু হিব্বান ও যাহাবী এটিকে ছহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর পরবর্তীটিসহ এটি ইরওয়াউল গালীলে উদ্ধৃত হয়েছে (৩৪২)।

(৪) আবু দাউদ ও তিরমিযী হাসান সনদ, "মাসায়েল উস্মু হানীতে" ইমাম আহমাদ এ কথাই বলেছেন। (১/৫০)

(৫) বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, ত্বহাবী ও আহমাদ।

এমনিভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত পড়তেন এবং তার সব ক্বিরাআত এরূপই ছিল। আয়াতসমূহের শেষে ওয়াক্বফ্ করতেন, পরবর্তী আয়াতের সাথে সংযুক্ত করতেন না।[১] কখনো কখনো ملك يوم الدين পাঠ করতেন।[২]

ركنية سورة (الفاتحة) وفضلها

সূরা ফাতিহার রুকন হওয়া ও তার ফযীলতসমূহ।

তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সূরাটির মর্যাদা খুব বড় করে দেখাতেন। তিনি বলতেন ঃ

«لاصلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا»

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ও তদূর্ধ্ব কিছু পড়বে না, তার ছলাত হবে না।[৩]

অন্য শব্দে আছে ঃ «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب»

অর্থ ঃ ঐ ছলাত যথেষ্ট নয় যাতে মুছল্লী ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।[৪]

কখনও বলতেন ঃ

«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام»

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এমন ছলাত পড়ল যাতে সূরা ফাতিহা পড়ে নাই সে ছলাত ত্রুটিপূর্ণ[৫] ত্রুটিপূর্ণ তথা অসম্পূর্ণ।[৬] তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন ঃ

---

[১] আবু দাউদ, সাহমী (৬৪-৬৫) হাকিম এটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সমর্থন করেছেন, আর এটি ইরওয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে (৩৪৩)। আবূ আমরুদ্দানী এটিকে "আল-মুকতাফা"তে বর্ণনা করেছেন (২/৫) এবং বলেছেন ঃ এ হাদীছের অনেকগুলো সূত্র রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এটিই মূল। অতঃপর বলেন, পূর্বসুরী এক গোষ্ঠী ইমাম ও অতীতের একদল ক্বারী আয়াতগুলোকে কেটে কেটে পাঠ করা পছন্দ করতেন— যদি একটির অপরটির সাথে সংযোগ বিদ্যমান থাকতো।
আমি বলতে চাই ঃ এটি এমন একটি সুন্নাত যা থেকে এই যুগের বেশীরভাগ ক্বারীগণ বিমুখ হয়ে আছেন অন্যদের কথা বলাই বাহুল্য।

[২] তাম্মাম আর্ রাযী الفوائد গ্রন্থে, ইবনু আবী দাউদ المصاحف গ্রন্থে ২/৭) আবু নু'য়াইম أخبار أصبهان গ্রন্থে (১/১০৪), হাকিম, একে ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এই ক্বিরাআতটি অপর ক্বিরাআত مالك এর ন্যায় মুতাওয়াতির সনদ দ্বারা সাব্যস্ত।

[৩] বুখারী, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, বাইহাক্বী। আর এটি "الإرواء" (৩০২)-তে উদ্ধৃত হয়েছে।

[৪] দারাকুতনী একে ছহীহ বলেছেন, ইবনু হিব্বানও স্বীয় "ছহীহ" গ্রন্থে। এটি পূর্বোক্ত গ্রন্থে অর্থাৎ الإرواء (৩০২)-তে রয়েছে।

[৫] خداج শব্দের ব্যাখ্যা হাদীছের শেষাংশেই রয়েছে যা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) غير تمام শব্দ দ্বারা করেছেন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ।

[৬] মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

«قال الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل»

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেছেন ঃ আমি ছলাতকে[১] আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে দু'ভাগে ভাগ করেছি তাই এর অর্ধেক আমার এবং অপর অর্ধেক আমার বান্দার। আর আমার বান্দাহ যা চাইবে তাই তাকে দান করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা এটি পড় (কারণ) বান্দাহ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বললে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করল। বান্দাহ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বললে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমার বান্দাহ আমার গুণকীর্তন করল। বান্দাহ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বললে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমার বান্দাহ আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল। বান্দাহ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বললে আল্লাহ্ বলেন ঃ এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে এবং আমার বান্দাহ যা চাবে তাই পাবে। বান্দাহ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বললে আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমার বান্দার জন্য এগুলো সবই আর সে যাই চাবে তাই পাবে।[২]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন, ঃ মহামহিম আল্লাহ তাওরাত ও ইঞ্জিলে কুরআনের মূল (ফাতিহা) সমতুল্য কোন সূরা অবতীর্ণ করেন নাই, এটাই (কুরআনের উল্লেখিত) সাবউল মাছানী বা পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাত আয়াত[৩] বিশিষ্ট সূরা ও সুমহান কুরআন যা আমাকে দান করা হয়েছে।[৪]

---

[১] এখানে ছলাত দ্বারা সূরা ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে এটা সম্মানার্থে পূর্ণাঙ্গ বলে একাংশ উদ্দেশ্য নেয়ার পর্যায়ভুক্ত।

[২] মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ্ ও মালিক সাহমীর লিখিত তারীখ জুরজান (১৪৪) এ জাবীর রাযিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীছ থেকে এর সহযোগী বর্ণনা রয়েছে।

[৩] বাজী বলেন ঃ একথা দ্বারা নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর এই বাণীটি উদ্দেশ্য করেছেন ঃ «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم»

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি তোমাকে (হে নবী!) পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাত আয়াত এবং সুমহান কুরআন দান করেছি। সাত এজন্য বলা হল যে, এতে সাতটি আয়াত রয়েছে, আর পুনঃ পঠিতব্য এজন্য বলা হল যে, একে প্রত্যেক রাক'আতে পুনঃ পুনঃ পাঠ করা হয়। আর তাকে মহান কুরআন এজন্য বলা হয় যে, এই নামে তার বিশেষত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য বস্তুত কুরআনের সবটুকুই মহান কুরআন। এর দৃষ্টান্ত যেমন কা'বা শরীফকে আল্লাহর ঘর নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে অথচ সব ঘরই আল্লাহর। কিন্তু শুধু তার বিশেষত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্যেই (বাইতুল্লাহ) বলা হয়।

[৪] নাসাঈ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন আর যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাতে ত্রুটিকারীকে ছালাতে এই সূরা পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] তবে যে ব্যক্তি এটা মুখস্থ করতে অপারগ তাকে বলেছেন ঃ তুমি এই দু'আ পড়বে।[২]

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

তিনি ছালাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন কুরআন পড়া জানলে তা পাঠ করবে নচেৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اللهُ أَكْبَرُ ও لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ পড়বে।[৩]

نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية

সরব ক্বিরা'আত সম্পন্ন ছালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরা'আত পড়ার বিধান রহিত।[৪]

নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুক্তাদীদেরকে সরব ক্বিরাআত সম্পন্ন ছালাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন যেমন একদা ফজরের ছালাতে ক্বিরাআত পড়াকালে পড়া ভারী লাগলে ছালাত শেষে তিনি বললেন- সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়ছিলে। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল হ্যাঁ, আমরা তাড়াহুড়া করে[৫] তা করি। তিনি বললেন ঃ এমনটি কর না, তবে তোমাদের সূরা ফাতিহা পড়াটা স্বতন্ত্র, কেননা এটি যে পড়ে না তার ছালাত হয় না।[৬] পরবর্তীতে প্রকাশ্য শব্দ বিশিষ্ট ছালাতে সব ধরনের ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করে দেন আর তা এভাবে যে তিনি একদিন সরব ক্বিরাআত সম্পন্ন ছালাত শেষে, অপর এক বর্ণনানুযায়ী ফজরের ছালাত শেষে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এই মুহূর্তে আমার সাথে ক্বিরাআত পড়েছো? এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ আমি পড়েছি- হে আল্লাহর রাসূল![৭] তিনি

---

(১) বুখারী, ছহীহ সনদে جزء القراءة خلف الإمام গ্রন্থে।

(২) আবু দাউদ, ইবনু খুযাইমা (১/৮০/২), হাকিম, ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান- তিনি ও হাকিম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি ইরওয়া الإرواء গ্রন্থে ৩০৩ রয়েছে।

(৩) আবু দাউদ, তিরমিযী এবং তিনি একে হাসান বলেছেন, এর সনদ ছহীহ صحيح أبي داود (৮০৭)।

(৪) পরের পৃষ্ঠার ১ নং টীকা দেখুন।

(৫) এখানে الهذ শব্দ এসেছে যার অর্থ তাড়াতাড়ি করে ক্বিরাত পড়া ও তাড়াহুড়া করে ক্বিরাত ধরা।

(৬) বুখারী স্বীয় جزء গ্রন্থে, আবু দাউদ ও আহমাদ এবং তিরমিযী, দারাকুত্বনী একে হাসান বলেছেন।

(৭) মূলতঃ এ হাদীছটি বা তার বক্তব্য পূর্বের হাদীছের ناسخ বা রহিতকারী নয় যেমনটি বুঝেছেন আল্লামা আলবানী (রহঃ)। বরং এটিতে পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে=

বললেন ঃ (তাইতো) আমি বলছি কুরআন পাঠে আমার সাথে দ্বন্দ্ব হচ্ছে কেন?[১] আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ এতদশ্রবণে লোকজন রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে সরব ক্বিরাআত বিশিষ্ট ছালাতে ক্বিরাআত পড়া থেকে বিরত হয়ে যায়, এবং ইমাম যে সব ছালাতে সরব ক্বিরাআত পড়তেন না সে সব ছালাতে তারা মনে মনে চুপিসারে ক্বিরাআত পড়তে থাকে।[২]

তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামের ক্বিরাআত শ্রবণার্থে চুপ থাকাকে ইমামের পূর্ণ অনুসরণ গণ্য করে বলেন ঃ

« إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا »

অর্থ ঃ ইমামকে কেবল তার অনুসরণের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে অতএব তিনি যখন আল্লাহ আকবার বলেন তখন তোমরা আল্লাহ আকবার বল এবং তিনি যখন ক্বিরাত পড়েন তখন তোমরা চুপ থাকবে।[৩]

এমনিভাবে তিনি ইমামের ক্বিরাত শ্রবণকে তাঁর পিছনে ক্বিরাত পাঠ থেকে প্রয়োজন মুক্তকারী ধরেছেন। তিনি বলেন ঃ

এই মাত্র। পূর্বের হাদীছে অনেক মুছল্লী কর্তৃক কিরা'আত পাঠের মাধ্যমে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরা'আতে বিভ্রাট ঘটেছিল। যার জন্য সবাই ঐ ভাবেই কিরা'আত পাঠ করতে থাকে, পরবর্তীতে এক ফজরের ছলাতে মাত্র এক ব্যক্তি বিভ্রাটমূলক কিরাত পাঠের মাধ্যমে উক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায়, সম্ভবতঃ এ ব্যক্তি পূর্বোক্ত ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন না। ছলাত শেষান্তে এ ব্যক্তিকেও বিভ্রাট মূলক কিরা'আত করা থেকে নিষেধ করে দেন। এবার সবাই বিভ্রাট মূলক কিরা'আত থেকে বিরত হয়ে গেল। আমাদের এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে একই রাবীর অর্থাৎ আবূ হুরাইরার বর্ণিত হাদীছ রয়েছে যা মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। "আবূ হুরাইরাকে তার কোন শিষ্য জিজ্ঞেস করেছিল ইমামের কিরাআতকালে আমি কিভাবে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করব। তিনি বললেন, اقرأ بها في نفسك মনে মনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করবে।

অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ইমামের সরবে কিরা'আতকালে মুক্তাদীর পাঠ না করে চুপ থেকে শুনার নির্দেশ ও সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া ছলাত হয় না এর মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। বরং দু'হাদীছের মর্ম একই। কারণ একাগ্রতার সাথে চুপ থেকে শুনলেই– মনে মনে পড়া হয়ে যায়। (সম্পাদক)

(১) খত্ত্বাবী বলেন ঃ এখানে تنازع শব্দের অর্থ ঃ এক ক্বিরাআতে অপরটির অনুপ্রবেশ ঘটানো ও একটির অপরটির উপর প্রাধান্য লাভ। এই শব্দের আরেকটি অর্থ হল, পরস্পর অংশগ্রহণ ও পালাক্রমে কোন কাজ করা.....; এখানে দ্বিতীয় অর্থই চূড়ান্ত যেহেতু ছাহাবাগণ সম্পূর্ণভাবে ক্বিরা'আত পড়া থেকে বিরত হয়ে যান। যদি এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকত তাহলে তারা ক্বিরা'আত থেকে বিরত হতেন না বরং শুধু দ্বন্দ্ব লাগানো থেকে বিরত হলেই চলত, এই বক্তব্যটি সুস্পষ্ট।

(২) মালিক, হুমাইদী, বুখারী স্বীয় جزء, আবু দাউদ, আহমাদ, আল মুহামিলী (১/১৩৯/৬) তিরমিযী একে হাসান বলেছেন, আবু হাতিম রাযী, ইবনু হিব্বান ও ইবনুল কাইয়িম একে ছহীহ বলেছেন।

(৩) ইবনু আবী শাইবাহ (১/৯৭/১), আবু দাউদ, মুসলিম, আবু আওয়ানাহ্, আররুইয়ানী স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে (১/১১৯/২৪), এটি "আল-ইরওয়া"তে রয়েছে (৩৩২ ও ৩৯৪)

«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»

অর্থ ঃ যে ব্যক্তির ইমাম থাকবে তার ইমামের ক্বিরাতই তার ক্বিরাতের জন্য যথেষ্ট।[১]

এ হাদীছ সরব ক্বিরাত বিশিষ্ট ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

وجوب القراءة في السرية

নীরব ক্বিরা'আত সম্পন্ন ছালাতে (মুক্তাদীর) ক্বিরা'আত পড়া ফরয

নীরব ক্বিরাআত সম্পন্ন ছালাতে (মুক্তাদীর) ক্বির'আত পড়াকে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহাল রেখেছেন। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন–

«كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب»

আমরা যুহর এবং আছরের ছালাতে প্রথম দু'রাকাআতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা ও অপর একটি সূরা পাঠ করতাম এবং পরবর্তী দুই রাকাআতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতাম।[২]

তিনি (যুহর ও আছরের ছালাতে) কেবল সরবে ক্বিরাআত পড়ে তাঁকে বিব্রত করতে নিষেধ করেছেন যেমন একদা তিনি যুহরের ছালাত ছাহাবাদেরকে নিয়ে আদায় করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى পাঠ করেছে? এক ব্যক্তি বলল (হে আল্লাহ্‌ রাসূল) আমি, তবে আমি এর মাধ্যমে শুধু ভাল ছাড়া আর কিছুই ইচ্ছা করিনি। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আমি টের পেয়েছি যে এক ব্যক্তি ক্বিরাআত নিয়ে আমার সাথে টানাহেঁচড়া করছে।[৩]

অপর হাদীছে এসেছে ঃ তাঁরা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিছনে সরবে ক্বিরাআত পড়তেন, তাই তিনি বললেন, তোমরা আমার সাথে কুরআনকে সংমিশ্রণ করে ফেলেছ।[৪] তিনি আরো বলেন ঃ "ছালাত আদায়কারী স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কানাকানি করে। তাই সে যেন চিন্তা করে কিসের দ্বারা তার সাথে কানাকানি করবে। তোমরা কুরআন পাঠকালে একে অপরের উপর

---

[১] ইবনু আবী শাইবাহ (১/৯৭/১) দারাকুত্বনী, ইবনু মাজাহ, ত্বাহাবী ও আহমাদ একে মুসনাদ ও মুরসালভাবে অনেক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ একে শক্তিশালী বলেছেন। যেমনটি রয়েছে ইবনু আবদিল হাদীর الفروع (২/৪৮ ক) গ্রন্থে। বুছিরী; এর কোন কোন সূত্রকে ছহীহ বলেছেন। আমি মূল কিতাবে এর সূত্রগুলো জড় করেছি এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতঃপর إرواء الغليل এও তাই করেছি (৫০০)।

[২] ছহীহ সনদে ইবনু মাজাহ। এটি الإرواء তেও উদ্ধৃত হয়েছে (৫০৬)।

[৩] মুসলিম, আবু আওয়ানা ও আস্‌সারাজ। خالج শব্দের অর্থ টানা হেঁচড়া করা।

[৪] বুখারী স্বীয় جزء গ্রন্থে, আহমাদ ও আস্‌সারাজ, হাসান সনদে।

শব্দ উঁচু করবে না।[১]

তিনি বলতেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি অক্ষর পাঠ করে তার জন্য একটি ছওয়াব, আর প্রতিটি ছওয়াবের বিনিময় দশগুণ পাবে। আমি বলি না যে, الم একটি অক্ষর, বরং الف একটি অক্ষর, لام একটি অক্ষর এবং ميم একটি অক্ষর।[২]

التأمين وجهر الإمام به

আমীন প্রসঙ্গ ও ইমামের শব্দ করে আমীন বলা

অতঃপর তিনি যখন ফাতিহা পাঠ শেষ করতেন তখন প্রকাশ্য ও দীর্ঘ স্বরে আমীন বলতেন।[৩]

তিনি মুক্তাদীদেরকে ইমামের আমীন বলার একটু পরেই (সাথে সাথে) আমীন বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইমাম যখন বলেন ঃ غير المغضوب عليهم ولا الضالين তখন তোমরা আমীন বলবে কেননা (তখন) ফিরিশতাগণ আমীন বলেন এবং ইমামও আমীন বলেন। অপর শব্দে ইমাম যখন আমীন বলেন তখন তোমরা আমীন বলবে কেননা যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে (অপর শব্দে ঃ তোমাদের কেউ যখন ছালাতে আমীন বলে এবং ফিরিশতাগণ আসমানে আমীন বলেন, ফলে যদি একজনেরটা অপরজনের সাথে মিলে যায় তাহলে) তার পূর্বকৃত সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।[৪] অপর হাদীছে বলেছেন ঃ فقولوا آمين يجبكم الله তোমরা আমীন বলবে

---

[১] মালিক, বুখারী أفعال العباد গ্রন্থে ছহীহ সনদে।

ফায়েদাহ ঃ স্বরব কিরা'আত বিশিষ্ট ছালাতে নয় বরং শুধু নীরব কিরা'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমামের পিছনে কিরা'আত পড়ার পক্ষে রয়েছেন ইমাম শাফি'ঈ পুরানো বক্তব্যে, ইমাম আবূ হানীফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মদ তার থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াত অনুসারে, আরো একে গ্রহণ করেছেন মোল্লা আলী কারী হানাফী এবং হানাফী মাযহাবের কিছু সংখ্যক মাশায়িখ। এটিই হলো ইমাম যুহরী, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সহ মুহাদ্দিছগণের এক দল ও অন্যান্যদের মত- এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

[২] তিরমিযী, হাকিম ছহীহ সনদে আ-জুররী একে আদাবু হামালাতিল কুরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এটা الصحيحة তে উদ্ধৃত হয়েছে (৬৬০) পক্ষান্তরে যে হাদীছে এসেছে من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বিরাত পাঠ করে তার মুখ অগ্নি দ্বারা ভরপুর করা হবে। এই হাদীছটি বানোয়াট জাল। এর বর্ণনা- سلسلة الأحاديث الضعيفة তে রয়েছে (৫৬৯)।

[৩] বুখারী جزء القراءة خلف الإمام, আবু দাউদ ছহীহ সনদে।

[৪] বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, দারিমী। অতিরিক্ত কথাগুলো শেষোক্ত দু'জনের। হাফিয ইবনু হাজর ফতহুল বারীতে আবূ দাউদের কথাও উল্লেখ করেছেন কিন্তু তা তার ধারণা মাত্র। তবে হাদীছ দ্বারা ইমামের আমীন না বলার উপর প্রমাণ গ্রহণ করা==

আল্লাহ পাক তোমাদের দু'আ কবুল করবেন।[১] তিনি বলতেন ঃ

« ما حسدتكم اليهود على شيء ماحسدتكم على السلام والتأمين »

ইয়াহুদরা তোমাদের সালাম ও (ইমামের পিছনে) আমীন বলার উপর যেরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে অন্য কোন বিষয়ে এরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে না।[২]

قراءته ﷺ بعد (الفاتحة)

সূরা ফাতিহা পাঠের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরা'আত

তিনি সূরা ফাতিহা পাঠান্তে অপর একটি সূরা পাঠ করতেন। কখনও তিনি ক্বিরা'আত দীর্ঘ করতেন আবার কখনও কারণ বশত সংক্ষিপ্ত করতেন। যেমন সফর, কাশি, রোগ অথবা (ছালাতে উপস্থিত মহিলার) শিশুর কান্নার কারণে। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা ফজরের ছালাত সংক্ষেপ[৩] করলেন। অপর এক হাদীছে আছে ঃ তিনি ফজরের ছালাতে কুরআনের সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত দু'টি সূরা পাঠ করলেন, জিজ্ঞাসা করা হল– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন এরূপ সংক্ষেপ করলেন? প্রতি উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি একটি শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে

বাত্বিল প্রতিপন্ন হচ্ছে। যেমন ইমাম মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন– এটা ইমামের আমীন বলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। আমি বলতে চাই, দ্বিতীয় শব্দটি এর সাক্ষ্য বহন করে। ইবনু আব্দিল বার التمهيد গ্রন্থে (৭/১৩) বলেন– এটি হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিমদের বক্তব্য, তাদের মধ্যে মদিনাবাসীদের বর্ণনানুযায়ী ইমাম মালিকও একজন। কারণ এ বিষয়ে ছহীহ্ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীছ এসেছে। একটি আবু হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কর্তৃক (অর্থাৎ অত্র হাদীছ) ও অপরটি ওয়ায়েল বিন হুজর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বর্ণিত অর্থাৎ এর পূর্বেরটি।

(১) মুসলিম ও আবু 'আওয়ানাহ্।

(২) বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমাহ, আহমাদ ও আস্‌সাররাজ দুটি ছহীহ সনদে। ফায়েদাহ ঃ মুক্তাদীদের "আমীন" বলা ইমামের বলার সাথে সাথে প্রকাশ্য শব্দে হবে।
ইমামের পূর্বে বলবেনা, যেমনটি অধিকাংশ মুছল্লী করে থাকে। আর ইমামের পরেও বলবে না। এ নিয়মই পরিশেষে আমার নিকট প্রাধান্যযোগ্য বলে প্রকাশ পেয়েছে। যেমনটি তদন্ত সাপেক্ষে সাব্যস্ত করেছি আমার কোন্ কোন গ্রন্থে, তার মধ্যে অন্যতম ৫৫৩ সিলসিলা যঈফাহ ৯৫২, ছহীহুত্ তারগীব অত্‌তারহীব ১ম খণ্ড ২০৫ পৃষ্ঠা।

(৩) এখানে تجوز শব্দের অর্থ হচ্ছে হালকা করলেন, এ হাদীছ ও এর অর্থবহ হাদীছগুলো শিশুদেরকে মসজিদে নিয়ে আসার বৈধতার প্রমাণ বহন করে। পক্ষান্তরে সচরাচর মানুষের মুখে যে হাদীছ শুনা যায়– « جنبوا مساجدكم صبيانكم » অর্থঃ তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে মসজিদ থেকে দূরে রাখ। এ হাদীছটি দূর্বল বা অশুদ্ধ। সবার ঐকমত্যে এটা প্রমাণ যোগ্য নয়। যারা একে যঈফ বলেছেন তাদের মধ্যে আছেন ইবনুল জাউযী, আল মুনযিরী, আল হাইসামী, হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী, আল-বূসিরী। আব্দুল হক আর-ইশবিলী বলেন– এর কোন ভিত্তি নেই।

অনুমান করলাম যে, তার মা হয়ত আমাদের সাথে ছালাত পড়ছে, এজন্য শিশুটির মাকে তার জন্য অবসর দেয়ার ইচ্ছায় এরূপ করলাম।[১] তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন ঃ আমি ছালাতে প্রবেশকালে তাকে দীর্ঘ করার ইচ্ছা রাখি, অতঃপর শিশুর কান্না শুনে সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। কেননা আমি তার প্রতি মায়ের গভীর উদ্বিগ্নতার কথা জানি।[২] তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরার প্রথম থেকে ক্বিরা'আত শুরু করতেন এবং অধিকাংশ সময়ে তা পূর্ণ করতেন।[৩] তিনি বলতেন ঃ রুকূ ও সাজদার পূর্বে প্রত্যেক সূরাকে তার অংশ (পূর্ণাঙ্গতা) দাও (অর্থাৎ শেষ করো)।[৪] অপর শব্দে আছে; প্রত্যেক সূরার জন্য রাকা'আত রয়েছে।[৫] কখনো তিনি এক সূরাকে দুই রাক'আতে ভাগ করে পড়তেন।[৬] আবার কখনো এক সূরাকেই দ্বিতীয় রাক'আতে পুনরাবৃত্তি করতেন।[৭]

কখনো তিনি একই রাক'আতে দুই বা ততোধিক সূরা পাঠ করতেন।[৮]

জনৈক আনছারী ছাহাবী কুবা মসজিদে তাদের (কুবাবাসীদের) ইমামত করতেন। তিনি কিরা'আত পাঠের[৯] পূর্বে ﴿ قل هو الله أحد ﴾ (ইখলাছ) সূরাটি পাঠ করতেন। অতঃপর তার সাথে অপর আরেকটি সূরা পাঠ করতেন। প্রত্যেক রাক'আতে এরূপ করতেন। ছাহাবাগণ এই নিয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন যে, আপনি সূরা ইখলাছ দ্বারা কিরা'আত শুরু করেন অতঃপর যথেষ্ট মনে না করে অপর আরেকটি সূরা পাঠ করেন। (বরং) হয় আপনি সূরা ইখলাছই পড়বেন আর না হয় এ ছাড়া অন্য সূরা পাঠ করবেন। তিনি বললেন ঃ আমি তা ছাড়তে পারবনা। এই সূরাসহ (ছালাত পড়ানো) যদি তোমাদের ভাল লাগে তবে আমি তোমাদের ইমামত করতে পারি, আর যদি তোমাদের খারাপ লাগে তবে আমি তোমাদের থেকে বিদায় গ্রহণ করব। বস্তুতঃ তাদের দৃষ্টিতে ওদের মধ্যে এই ছাহাবীই সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁদের ইমাম হওয়াকে তাঁরা অপছন্দ করতেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদের কাছে আগমন করলে তাঁরা বিষয়টি খুলে বললেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১] বিশুদ্ধ সনদে আহমাদ, অপর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবী দাউদ « المصاحف » "আল-মাছহিফ" গ্রন্থে (৪/১৪/২)।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

[৩] এর উপর অনেক হাদীছ প্রমাণ বহন করে যেগুলো পরবর্তীতে আসবে।

[৪] ইবনু আবী শাইবাহ (১/১০০/১) আহমাদ, আব্দুল গানী আল মাক্বদিসী, বিশুদ্ধ সনদে-সুনান « السنن » গ্রন্থে (৯/২)।

[৫] বিশুদ্ধ সনদে ইবনু নছর ও ত্বাহাবী। আমার (আলবানীর) নিকট হাদীছের অর্থ হচ্ছে– প্রত্যেক রাক'আতে একটি সূরা পাঠ করা যাতে রাক'আতের পূর্ণ হক্ব আদায় হয়। এখানে আদেশ দ্বারা শ্রেয়মূলক আদেশ উদ্দেশ্য, অনিবার্যমূলক নয়। অর্থাৎ এরূপ করাই শ্রেয়। যার প্রমাণ পরবর্তীতে আসছে।

[৬] আহমাদ ও আবু ইয়া'লা দুটি সূত্রে। "ফজরের ছালাতে কিরাত" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

[৭] যেমনটি করেছিলেন ফজরের ছালাতে, আর তা অনতি দূরেই আসছে।

[৮] এর ব্যাখ্যা ও উদ্ধৃতি অনতি দূরেই আসছে।

[৯] অর্থাৎ ফাতেহা পাঠের পর যে সূরাটি পাঠ করতে চাইতেন তার পূর্বে।

ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ হে অমুক ব্যক্তি! তোমার সাথীদের নির্দেশ মানতে তোমার বাধা কী? এবং প্রত্যেক রাক'আতে তোমাকে এই সূরা পড়তে কোন্ জিনিসটি উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি সূরাটিকে ভালবাসি। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ ঐ সূরাটির ভালবাসা তোমাকে জান্নাতী বানিয়ে দিয়েছে।[১]

جمعه ﷺ بين النظائر وغيرها في الركعة

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এক রাক্'আতে সমার্থবোধক ও অন্য সূরার সংযুক্তি করণ

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমার্থবোধক[২] লম্বা (মুফাসসাল) সূরাগুলো একত্রিত করতেন যেমন তিনি এক রাক্'আতে সূরা 'আর-রহমান' (৫৫ঃ৭৮)[৩] ও "আন্নাজম" (৫৩ঃ৬২) পড়তেন এবং ইক্‌তারাবাত (৫৪ঃ৫৫) ও "আল্হা-ক্কাহ" (৬৯ঃ৫২) অপর রাক্'আতে পড়তেন। সূরা "আত্-তূর" (৫২ঃ৪৯) ও "আয্-যারিয়াত" (৫১ঃ৬০) এক রাক্'আতে পড়তেন এবং সূরা "ইযা অক্বাআত" (৫৬ঃ৯৬) ও "নূন" (৬৮ঃ৫২) অপর রাক্'আতে পড়তেন। সূরা "সাআলা সায়িল" (৭০ঃ৪৪) ও "আন্-নাযিআত" (৭৯ঃ৪৬) এক রাক্'আতে পড়তেন এবং সূরা "ওয়াইলুল্লিল্ মুতাফ্‌ফিফীন" (৮৩ঃ৩৬) ও "আবাসা" (৮০ঃ৪২) অপর রাক্'আতে পড়তেন। সূরা "মুদ্দাস্সির" (৭৪ঃ৫৬) ও "আল-মুয্যাম্মিল" (৭৩ঃ২০) এক রাক্'আতে পড়তেন এবং সূরা "হাল আতা" অর্থাৎ সূরা ইনসান (৭৬ঃ৩১) ও "লা-উক্বসিমু বিইয়াউমিল কিয়ামাহ" (৭৫ঃ৪০) অপর রাক্'আতে পড়তেন। আবার "আম্মা ইয়াতাসা-আলুন" (৭৮ঃ৪০) ও "আল মুরসালা-ত" (৭৭ঃ৫০) এক রাক্'আতে পড়তেন এবং "আদ্দুখান" (৪৪ঃ৫৯) ও "ইজাশ্ শামসু কুভ্ভীরাত" (৮১ঃ২৯) অপর রাক্'আতে পড়তেন।[৪]

কখনো তিনি (السبع الطوال) সাতটি লম্বা সূরা থেকে একাধিক সূরা

---

[১] বুখারী সনদ বিহীনভাবে, তিরমিযী অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণনা করে একে ছহীহ বলেছেন।

[২] তথা অর্থগতভাবে এক অপরের সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন উপদেশ বিধান ও কাহিনী ইত্যাদি। المفصل দীর্ঘ সূরার শেষ সীমা সবার ঐকমত্যে কুরআনের শেষ পর্যন্ত এবং এর শুরু সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সূরা "ক্বাফ" থেকে।

[৩] প্রথম সংখ্যাটি সূরার ক্রমিক নং এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে– আয়াতের সংখ্যা। প্রথম সংখ্যাটি আমাদের জন্য স্পষ্ট করছে যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সূরাগুলো একত্রে পাঠকালে কুরআনে এগুলোর যে ধারাবাহিকতা রয়েছে সেদিকে নযর দেননি। সুতরাং এর দ্বারা ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ করার বৈধতা প্রমাণিত হল। "রাত্রিকালীন (নফল) ছালাতে কির'আতের ব্যাপারও তাই যা অচিরেই আসছে। তবে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করাই উত্তম।

[৪] বুখারী ও মুসলিম।

একত্রিত করতেন। যেমন সূরা "বাক্বারা", "নিসা" ও "আলু-ইমরান"-কে রাত্রের নফল ছালাতের এক রাক'আতে পাঠ করতেন, যার বর্ণনা অচিরেই আসছে। তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ। أفضل الصلاة طول القيام। অর্থঃ সর্বোত্তম ছালাত হচ্ছে দীর্ঘ কিয়াম বিশিষ্ট ছালাত।[১]

তিনি যখন أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ অর্থাৎ- এই আল্লাহ্ কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? এই আয়াত পড়তেন তখন বলতেন- سُبْحَانَكَ فَبَلَىٰ অর্থঃ আমি তোমার পবিত্রতা জ্ঞান পূর্বক বলছি, হ্যাঁ। আর যখন পড়তেন- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى অর্থঃ তুমি স্বীয় প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা জ্ঞাপন কর তখন বলতেন ঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ অর্থাৎ- হে আমার মহান প্রতিপালক! আমি তোমার পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি।[২]

جواز الاقتصار على الفاتحة
শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার উপর ক্ষান্ত হওয়া বৈধ

মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এশার ছালাত পড়তেন অতঃপর ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করতেন। তিনি এক রাত্রে ফিরে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে ছালাত পড়ছিলেন। তাঁর গোত্র বনু সালামার "সুলাইম" নামক একটি যুবকও (তার পিছনে) ছালাত পড়ছিল। যখন তার পক্ষে ছালাত দীর্ঘ বিবেচিত হল তখন সে জামা'আত ত্যাগ করে একাকী মসজিদের এক কিনারে ছালাত পড়ে বেরিয়ে গিয়ে স্বীয় উটের লাগাম ধরে চলে যায়। ছালাত শেষে মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ সংবাদ দেয়া হল। তিনি বলে ফেললেন ঃ এর মধ্যে মুনাফিক্বী রয়েছে। অবশ্যই আমি এই আচরণ সম্পর্কে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অবহিত করব। যুবকটি বলল ঃ আমিও মুয়াযের কৃতকর্মের কথা রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানাব। পরদিন সকাল বেলা দুজনই রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট হাযির হলেন। মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যুবকটির ঘটনা তাঁকে জানালেন। যুবক বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল, মুয়ায আপনার নিকট অনেকক্ষণ অবস্থান করে অতঃপর আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে আবার আমাদের প্রতি (ছালাত) দীর্ঘ করে। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু

---

[১] মুসলিম ও ত্বাহাবী।

[২] ছহীহ সনদে আবু দাউদ ও বাইহাক্বী। এ নিয়মটি উন্মুক্ত তাই ছালাতের ভিতর ও বাহির উভয় অবস্থা এবং ফরয ও নফল উভয় ছালাত এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ইবনু আবী শাইবাহ (২/১৩২/২) আবু মূসা আশ'য়ারী ও মুগীরাহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, তারা উভয়ে এগুলো ফরয ছালাতে বলতেন। পক্ষান্তরে উমার ও আলী (রাঃ) থেকে উন্মুক্তরূপে তা উদ্ধৃত হয়েছে।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ হে মুয়ায তুমি কি ফিৎনাবাজ? এই বলে তিনি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে ভাতিজা! তুমি কিভাবে ছালাত আদায় কর? সে বলল ঃ আমি সূরা ফাতিহা পড়ি এবং আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করি ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। তবে আমি আপনার ও মুয়াযের মৃদু শব্দের কথা (দু'আ কালাম) পরিষ্কারভাবে বুঝি না।[১] রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ আমি ও মুয়াযও এই দুই এর (জান্নাত চাওয়া ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দু'আর) আশে পাশেই আছি অথবা এ ধরনের অন্য কোন কথা বললেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ যুবকটি বলল ঃ তবে শীঘ্রই মুয়ায তখন বুঝবে যখন শত্রু সম্প্রদায় আসবে। আর ইতিমধ্যে তাদেরকে শত্রু আগমনের সংবাদ জানানো হয়েছিল। বর্ণনাকারী বলেন– অতঃপর তাঁরা এসে পড়ল এবং যুবকটি (যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে) শহীদ হয়ে গেল।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমার ও তোমার প্রতিপক্ষটির (যুবকটির) কী খবর?" তিনি বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে, আমিই বরং মিথ্যা সেজেছি, সে শাহাদৎ বরণ করেছে।[২]

الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها

ফরয ও নফল ছালাতে সরব ও নীরবে ক্বিরা'আত পাঠ প্রসঙ্গ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের ছালাত এবং মাগরিব ও ইশার ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সরবে ক্বিরা'আত পড়তেন এবং যুহর,

---

(১) এখানে دندنة শব্দের অর্থঃ কোন ব্যক্তির এমনভাবে কথা বলা যে, তার গুণগুণ শব্দ শুনা যায় কিন্তু কথা বুঝা যায় না ইহা هينمة শব্দ অপেক্ষা একটু উঁচু স্বর বুঝায়। (নিহায়াহ)

(২) ইবনু খুযাইমাহ স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে (১৬৩৪) এবং বাইহাক্বী, উত্তম সনদে, প্রমাণযোগ্য অংশটুকু আবু দাঊদে (৭৫৮ ছহীহ আবু দাঊদ)। ঘটনার মূল অংশটুকু বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। প্রথম বর্ধিত অংশটুকু মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, দ্বিতীয় বর্ধিত অংশটুকু মুসনাদে আহমাদে (৫/৭৪) তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ধিত অংশটুকু বুখারীতে রয়েছে। এই অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন তাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যকিছু পাঠ করেননি। আহমাদ (১/২৮২), হারিছ বিন আবী উসামা স্বীয় মুসনাদে (পৃষ্ঠা ৩৮ যাওয়াইদ) ও বাইহাক্বী (২/৬২) বর্ণনা করেছেন দুর্বল সনদে। আমি পূর্ববর্তী মুদ্রণগুলোতে এ হাদীছটিকে হাসান বলেছিলাম। অতঃপর আমার নিকট পরিস্ফুটিত হয়েছে যে, আমি ধারণা প্রসূতভাবে তা করেছি, কেননা এর ভিত্তি হচ্ছে হানযালা আদ্দাউসীর উপর, আর সে হচ্ছে দুর্বল। আমি বুঝতে পারছিনা, কিভাবে এ ব্যাপারটি আমার নিকট গোপন থেকে গেল! সম্ভবতঃ আমি তাকে অন্য লোক মনে করেছিলাম। মোট কথা আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যে, তিনি আমাকে নিজের ভুল ধরতে পারার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই আমি তাড়াতাড়ি করে কিতাব থেকে এটি বাদ দিয়েছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে উত্তম বিকল্প বের করে দেন যা হলো মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু ==

আছর, মাগরিবের তৃতীয় রাক্'আতে ও ইশা'র শেষ দু'রাক্'আতে নীরবে কিরা'আত পড়তেন।[১]

ছাহাবাগণ নীরব ক্বিরা'আত বিশিষ্ট ছালাতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাড়ির নড়াচড়া[২] দেখে আবার কখনো তাঁর দ্বারা তাদেরকে আয়াত বিশেষ শুনানোর মাধ্যমে তাঁর কুরআন পাঠের প্রমাণ পেতেন।[৩]

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আ, দুই ঈদ[৪] ইসতিসক্বা (পানি চাওয়া)[৫] ও সূর্য গ্রহণের[৬] ছালাতেও সরবে ক্বিরা'আত পাঠ করতেন।

الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل

রাতের নফল ছালাতে সরবে ও নীরবে কিরা'আত পাঠ[৭]

তিনি রাতের ছালাতে কখনো নীরবে এবং কখনো সরবে[৮] কিরা'আত পড়তেন। তিনি ঘরে ছালাত আদায় কালে হুজরায় অবস্থিত লোক তাঁর কিরা'আত শুনতে পেত[৯]। আর কখনো স্বীয় শব্দকে আরো উঁচু করতেন ফলে হুজরার বাহিরে অবস্থানরত লোকও তা শুনতে পেত।[১০]

আনহু)-এর এই হাদীছ। এটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছের সমার্থবোধক। সুতরাং সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি যার নিয়ামতে পুণ্য কার্যাদি সম্পন্ন হয়।

[১] এ বিষয়ে অনেক বিশুদ্ধ হাদীছ থাকার সাথে সাথে এর উপর মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমাও হয়েছে যা পূর্ববর্তীদের থেকে পরবর্তীদের দ্বারা সংকলিত হয়েছে। যেমনটি বলেছেন ইমাম নববী। অচিরেই এর কিছু পরবর্তীতে আসছে। আরো দেখুন- الإرواء (৩৪৫)

[২] বুখারী ও আবু দাউদ। [৩] বুখারী ও মুসলিম।

[৪] দেখুন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কিরা'আত (صلاة الجمعة ও صلاة العيدين) অধ্যায়ে।

[৫] বুখারী ও আবু দাউদ। [৬] বুখারী ও মুসলিম।

[৭] আব্দুল হক التهجد কিতাবে (৯০/১) বলেন : দিনের বেলার নফল ছালাতের ক্ষেত্রে নীরবে বা সরবে পড়ার কোন বিশুদ্ধ হাদীছ নেই তবে স্পষ্টত এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি নীরবেই পড়তেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন হুযাইফার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় তিনি সরব কির'আত দ্বারা ছালাত পড়ছিলেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হে আব্দুল্লাহ! তুমি আল্লাহকে শুনাও, আমাদেরকে না। কিন্তু এ হাদীছটি শক্তিশালী নয়।

[৮] বুখারী افعال العباد কিতাবে ও মুসলিম।

[৯] আবু দাউদ, তিরমিযী, হাসান সনদে الشمائل গ্রন্থে। الحجرة বলতে এখানে বাড়ীর দ্বার প্রান্তে তার সংশ্লিষ্ট ঘরসমূহের একটি ঘর বুঝানো হয়েছে। হাদীছের মর্ম হচ্ছে এই যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উচ্চস্বর এবং গোপন স্বরের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতেন।

[১০] নাসাঈ, তিরমিযী الشمائل গ্রন্থে এবং বাইহাকী الدلائل গ্রন্থে হাসান সনদে।

তিনি আবু বকর ও উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে এরই (এভাবে পড়ারই) আদেশ প্রদান করেছেন। আর তা ঐ সময় আদেশ দিয়েছিলেন যখন তিনি এক রাত্রে বাহির হয়ে শুনতে পেলেন, আবু বকর নিচুস্বরে ছালাত পড়ছেন, আবার উমরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে শুনতে পেলেন, তিনি উচ্চৈঃস্বরে ছালাত পড়ছেন। অতঃপর তারা উভয়ে যখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট একত্রিত হলেন তখন নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ হে আবু বকর! আমি তোমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম তখন তুমি নিম্নস্বরে ছালাত পড়ছিলে? তিনি জবাব দিলেন– হে আল্লাহর রাসূল, আমি যার সাথে কানা-কানি করেছি তাঁকে শুনিয়েছি। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন ঃ আমি (আজ রাত্রে) তোমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তুমি উচ্চৈঃস্বরে ছালাত পড়ছিলে? তিনি বললেন– হে আল্লাহর রাসূল, আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকদের জাগাই এবং শয়তানকে তাড়াই। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ হে আবু বকর! তোমার স্বর একটু উঁচু করবে, আর উমরকে বললেন ঃ হে উমার! তোমার স্বর একটু নিচু কর।[১] তিনি বলতেন– প্রকাশ্যে কুরআন পাঠকারী প্রকাশ্যে ছাদকা দাতার সমতুল্য, আর নীরবে কুরআন পাঠকারী গোপনে ছাদকাদাতার সমতুল্য।[২]

ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাতে যা পাঠ করতেন

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছালাতে যে সব আয়াত ও সূরাসমূহ পাঠ করতেন তা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ও অন্যান্য ছালাত ভেদে বিভিন্ন রকমের হত। এখানে পাঁচ ওয়াক্তের প্রথম ছালাত থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে বিশদ আলোচনা করা হলো।

صلاة الفجر

১। ফজরের ছালাত ঃ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (طوال المفصل) দীর্ঘ বিস্তীর্ণ[৩]

---

(১৩২) আবূ দাউদ, হাকিম, তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন।

(৩) বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী সেগুলো হচ্ছে– সূরা 'ক্বা-ফ' থেকে নিয়ে সাতটি সূরার নাম যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

সূরাগুলো পাঠ করতেন[১] কখনো সূরা ওয়াক্বি'আহ (৫৬:৯৬) ও এ ধরনের অন্য সূরা উভয় রাক্'আতে পাঠ করতেন।[২] তিনি বিদায় হাজ্জের সময় সূরা ত্বূর থেকে (৫২: ৪৯) পাঠ করেছিলেন।[৩]

"তিনি কখনো 'ক্বা-ফ' ওয়াল কুরআ-নিল মাজীদ।" (৫০:৪৫) এবং এ ধরনের অন্য সূরা প্রথম রাক'আতে পাঠ করতেন।[৪]

আবার কখনো <قصار المفصل> নাতিদীর্ঘ সূরা যেমন ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ (৮১:১৫) পাঠ করতেন।[৫]

একদা তিনি উভয় রাক্'আতেই ﴿إِذَا زُلْزِلَ﴾ (৯৯:৮) পাঠ করেন। এমনকি বর্ণনাকারী বলেন : আমি বুঝতে পারলাম না যে, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমনটি কি ভুল ক্রমে করলেন নাকি স্বেচ্ছায় করলেন?[৬] একবার সফরাবস্থায় তিনি ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (১১৩:৫) এবং ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (১১৪:৬) পাঠ করেন[৭] এবং উকবা বিন আ-মির (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন : তুমি ছালাতে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পাঠ করবে [কেননা এ দু'টির মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর তুলনা নাই][৮]

---

(১) ছহীহ সনদে নাসাঈ ও আহমাদ।

(২) আহমাদ, ইবনু খুযাইমা (১/৬৯/১) হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(৩) বুখারী ও মুসলিম।

(৪) মুসলিম ও তিরমিযী, এটি ও তার সাথে পরবর্তী হাদীছটি <الإرواء> গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩৪৫)

(৫) মুসলিম ও আবূ দাউদ।

(৬) ছহীহ সনদে আবূ দাউদ ও বাইহাক্বী, স্পষ্টতঃ যা বুঝা যায় তা এই যে, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কাজটি ইচ্ছাকৃতই ছিল–বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে।

(৭) আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ (১/৬৯/২) ইবনু বিশরান <الأمالي> তে ও ইবনু আবী শাইবাহ (১২/১৭৬/১), হাকিম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

(৮) ছহীহ সনদে আবূ দাউদ ও আহমাদ।

কোন সময় তিনি এতদাপেক্ষা বেশী পাঠ করতেন, ষাট কিংবা তার উর্ধে আয়াত পাঠ করতেন।[১]

এর কোন বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমি জানি না (ষাট আয়াত) এক রাক'আতে পড়তেন না দুই রাক'আতে।

তিনি সূরা 'রূম' (৩০ঃ৬০) পাঠ করতেন।[২] আবার কখনো সূরা 'ইয়াসীন' (৩৬/৮৩) পাঠ করতেন।[৩]

এক সময় তিনি মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় ফজরের ছালাতে সূরা 'আল'মুমিনূন' পাঠ করতে শুরু করেন, পরিশেষে যখন মূসা ও হারুন অথবা ঈসা[৪] (কোন বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে) এর উল্লেখ আসল তখন তাঁকে কাশি পেয়ে বসল ফলে তিনি রুকূতে চলে গেলেন।[৫]

কখনো তিনি 'অছ্ছাফ্ফাত' (৭৭ঃ১৮২) দ্বারা ছাহাবাদেরকে ছালাত পড়াতেন।[৬] তিনি জুমু'আর দিনের ফজর ছালাতে প্রথম রাক্'আতে আলিফ লা-ম মীম তানযিলুস সাজদাহ (৩২ঃ ৩০) ও দ্বিতীয় রাক্'আতে 'হাল আতা-আলাল ইনসান' (৭৬ঃ৩১) পাঠ করতেন।[৭] তিনি প্রথম রাক্'আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক্'আত সংক্ষিপ্ত করতেন।[৮]

---

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] উত্তম সনদে নাসাঈ, আহমাদ ও বায্যার। এটা হচ্ছে পরবর্তীকালের শেষ সিদ্ধান্ত যা ‹ تمام المنة › (১৮৫) ও অন্যান্য কিতাবে উল্লেখিত বক্তব্যের বিপরীত। বিষয়টি যেন উপলব্ধি করা হয়।

[৩] ছহীহ্ সনদে আহমাদ।

[৪] মূসা (আলাইহিস্‌সালাম)-এর উল্লেখ আল্লাহর এই আয়াতে রয়েছে ঃ

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾

আর ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর উল্লেখ এ থেকে চার আয়াত পরের আয়াতে রয়েছে যা হচ্ছে ঃ ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾

[৫] বুখারী মুআল্লাকভাবে (সনদছিন্নভাবে) ও মুসলিম, এটি ‹ الإرواء › তে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩৯৭)

[৬] আহমাদ, আবু ইয়ালা– উভয়েই স্বীয় মুসনদদ্বয়ে এবং মাক্বদিসী ‹ المختارة › তে।

[৭] বুখারী ও মুসলিম।

[৮] বুখারী ও মুসলিম।

القراءة في سنة الفجر
ফজরের সুন্নতে কিরা'আত

ফজরের দু'রাক'আত সুন্নত ছালাতে তাঁর কিরা'আত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল।[১] এমনকি 'আয়শা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সন্দেহমূলকভাবে বলতেন যে, তিনি কি আদৌ সূরা ফাতিহা পড়েছেন?[২] তিনি কখনো ফাতিহার পর প্রথম রাক'আতে (২:১৩৬) আয়াত তথা ঃ

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ এর শেষ পর্যন্ত পড়তেন।

এবং দ্বিতীয় রাক'আতে (৩:৬৪) আয়াত তথা ঃ

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

এর শেষ পর্যন্ত পড়তেন।[৩]

আবার কখনো এর (৩ ঃ ৬৪) পরিবর্তে (২৩ ঃ ৫২) তথা এই আয়াত ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ এর শেষ পর্যন্ত পড়তেন। [৪] কখনো প্রথম রাক'আতে ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (১০৯:৬) ও দ্বিতীয় রাক'আতে ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ পড়তেন।[৫]

তিনি বলতেন ঃ বড়ই ভাল সূরা দু'টি।[৬]

একবার তিনি এক ব্যক্তিকে প্রথম রাক'আতে প্রথম সূরাটি অর্থাৎ কাফিরুন পড়তে শুনে বললেন এ বান্দাটি স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আনতে পেরেছে অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দ্বিতীয় সূরা (ইখলাছ) পড়লে তিনি বললেন ঃ এই বান্দাটি স্বীয় রবকে চিনতে পেরেছে।[৭]

---

[১] ছহীহ সনদে আহমাদ।
[২] বুখারী ও মুসলিম।
[৩] মুসলিম, ইবনু খুযাইমাহ ও হাকিম।
[৪] মুসলিম ও আবূ দাউদ।
[৫] মুসলিম ও আবূ দাউদ।
[৬] ইবনু মাজাহ ও ইবনু খুযাইমাহ।
[৭] ত্বাহাভী, ইবনু হিব্বান স্বীয় صحيح গ্রন্থে, ইবনু বিশরান, হাফিয ইবনু হাজার একে الأحاديث العاليات গ্রন্থে (হাদীছ নং ১৬) হাসান বলেছেন।

صلاة الظهر

২। যহরের ছালাত ঃ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যহরের প্রথম দু'রাক্'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং সেই সাথে দু'টি সূরাও পড়তেন। দ্বিতীয় রাক্'আত অপেক্ষা প্রথম রাক্'আত দীর্ঘ করতেন।[১]

কখনো তিনি এ রাক্'আতটিকে এত দীর্ঘ করতেন যে, দীর্ঘায়িত করার ফলে ছালাত শুরু হওয়ার পর কোন ব্যক্তি বাকী' নামক স্থানে গিয়ে তার প্রয়োজন (শৌচকার্য) সেরে বাড়ি এসে উযূ করে উপস্থিত হয়েও তাঁকে প্রথম রাক'আতে পেত।[২]

ছাহাবাগণ ধারণা করতেন যে, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন করার পিছনে এই উদ্দেশ্য ছিল যে, লোকেরা যেন প্রথম রাক'আত পেয়ে যায়।[৩] তিনি প্রথম দুই রাক্'আতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। সূরা আলিফ লাম-তানযীল 'সাজদাহ' (২২ঃ৩০) এর সমপরিমাণ, এর ভিতর সূরা ফাতিহাও রয়েছে।[৪]

তিনি কখনো সূরা "ওয়াস্‌সামাই অততারিক্ব" বা "ওয়াস্ সামাই যা-তিল বুরুজ" কিংবা "ওয়াল্ লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা" বা এ জাতীয় অন্য কোন সূরা পাঠ করতেন।[৫] তিনি কখনো 'ইযাস্ সামা-উন শাককাত' বা এজাতীয় সূরাও পাঠ করতেন।[৬] ছাহাবাগণ যহর এবং আছরে তাঁর কিরাআত পাঠ অনুভব করতেন দাড়ির নড়াচড়া দেখে।[৭]

---

(১) বুখারী ও মুসলিম।

(২) মুসলিম ও বুখারী جزء القراءة গ্রন্থে।

(৩) ছহীহ সনদে আবু দাউদ ও ইবনু খুযাইমাহ (১/১৬৫/১)।

(৪) আহমাদ ও মুসলিম।

(৫) আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন, অনুরূপভাবে ইবনু খুযাইমাহও (১/৬৭/২)।

(৬) ইবনু খুযাইমাহ স্বীয় صحيح গ্রন্থে (১/৬৭/২)।

(৭) বুখারী ও আবূ দাউদ।

قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين

শেষের দু' রাক্'আতেই ফাতিহার পর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বিভিন্ন আয়াত পাঠের বর্ণনা

তিনি শেষ দু'রাক্'আতকে প্রথম দু'রাক্'আত অপেক্ষা সংক্ষেপ করতেন তথা অর্ধেকের পরিমাণ যা পনের আয়াতের মত হয়।[১] আবার কখনো তিনি এ দু'রাক্'আতে শুধু ফাতিহাই পড়তেন।[২]

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة

প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ ফরয

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছলাতে ত্রুটিকারীকে প্রথম রাক্'আতে সূরাহ ফাতিহাহ্ পাঠের নির্দেশ দেয়ার পর প্রত্যেক রাক্'আতে তা পাঠ করার আদেশ দেন।[৩] তিনি (তাকে প্রথম রাক্'আতে এটা পাঠ করার আদেশ দিয়ে) বলেন ঃ

---

[১] আহমাদ ও মুসলিম। এ হাদীছে শেষ দু'রাক্'আতে ফাতিহার অতিরিক্ত ক্বিরা'আত পাঠ সুন্নতসম্মত হওয়ার দলীল রয়েছে। এ কথার পক্ষে একদল ছাহাবা রয়েছেন তন্মধ্যে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রয়েছেন, ইমাম শাফি'ঈর এটাই বক্তব্য চাই তা যহরের ছালাতে হোক আর অন্য কোন ছলাতে হোক। আমাদের পরবর্তী উলামাদের মধ্যে এই মত গ্রহণ করেন আবুল হাসানাত লাক্ষৌভী ঃ التعليق الممجد على موطا محمد গ্রন্থে (১০২ পৃষ্ঠা)।
তিনি বলেন ঃ আমাদের কিছু সাথী আজগুবী কাজ করেছেন, তারা শেষ দুই রাক্'আতে ক্বিরা'আত পাঠের উপর সাহু-সাজদা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। المنية। কিতাবের ব্যাখ্যাতাগণ এর সুন্দর প্রতিবাদ করেছেন। যথা ইবরাহীম হালবী, ইবনু আমীর আল হাজ্জ ও অন্যান্যগণ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা এ কথার প্রবক্তা তাদের নিকট হাদীছ পৌঁছেনি। যদি তাদের নিকট হাদীছ পৌঁছত তবে অবশ্যই তারা এ কথা বলতেন না।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

[৩] শক্তিশালী সনদে আবু দাউদ ও আহমাদ।

« ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » وفي رواية : « في كل ركعة »

অতঃপর তোমার...... পুরো ছালাতে এ রকম করবে।[১] অপর এক বর্ণনায় আছে– প্রত্যেক রাক'আতে এ রকম করবে।[২] তিনি মাঝে মধ্যে মুক্তাদীদেরকে আয়াত বিশেষ শুনাতেন।[৩] ছাহাবাগণ কখনো রাসূলের কণ্ঠে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' (৮৭ঃ১৯) ও 'হাল আতা-কা হাদীছুল গাশিয়াহ' (৮৮ঃ২৬) পাঠ এর গুন-গুনানি শব্দ শুনতে পেতেন।[৪]

কখনো তিনি 'ওয়াস্‌সামা-ই যাতিল বুরুজ' (৮৫ঃ২২) বা 'ওয়াস্ সামা-ই ওয়াত্‌ত্বারিক' (৮৬ঃ১৭) কিংবা এ ধরনের অন্য সূরা পাঠ করতেন।[৫] কখনো 'ওয়াল্‌লাইলি ইযা ইয়াগশা' (৯২ঃ২১) বা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন।[৬]

صلاة العصر

৩। আছরের ছালাত

আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম দুই রাক'আতে 'সূরা ফাতিহা' এবং অপর দু'টি সূরা পাঠ করতেন। এবং প্রথম রাক'আতকে দ্বিতীয় রাক'আত অপেক্ষা দীর্ঘায়িত করতেন।[৭] ছাহাবাগণ ধারণা করতেন যে, তাঁর এরূপ করার পিছনে উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, লোকজন যেন রাক'আতটি পেয়ে যায়।[৮] তিনি উভয় রাক'আতে আনুমানিক পনের আয়াত তথা যহরে প্রথম দু'রাক্'আতের অর্ধেকের মত পাঠ করতেন। শেষ দু'রাক্'আতকে প্রথম দু'রাক্'আতের অর্ধেকের মত সংক্ষিপ্ত করতেন।[৯]

---

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] উত্তম সনদে আহমাদ।

[৩] বুখারী ও মুসলিম।

[৪] ইবনু খুযাইমা স্বীয় صحيح গ্রন্থে (১/৬৭/২) এবং যিয়া আলমাক্বদিসী المختارة গ্রন্থে ছহীহ সনদে।

[৫] বুখারী জুযউল ক্বিরা'আত গ্রন্থে ও তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

[৬] মুসলিম ও ত্বায়ালিসী।

[৭] বুখারী ও মুসলিম।

[৮] ছহীহ সনদে আবূ দাউদ ও ইবনু খুযাইমাহ্।

আবার তিনি এই উভয় রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।[১] তিনি মাঝে মধ্যে ছাহাবাদেরকে আয়াত বিশেষ শুনাতেন।[২] যহরের ছালাতে উল্লেখিত সূরাগুলো তিনি এই ছালাতেও পাঠ করতেন।

صلاة المغرب

৪। মাগরিবের ছালাত

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ছালাতে কখনো কখনো মুফাছছাল অংশের সংক্ষিপ্ত সূরাগুলো ﴾قصار المفصل﴿ পাঠ করতেন।[৩] তাঁর সাথে ছালাত শেষ করে ফিরার পথে যে কোন লোক স্বীয় তীর নিক্ষেপের স্থান দেখতে পেত।[৪]

তিনি কোন এক সফরে মাগরিবের দ্বিতীয় রাক'আতে 'ওয়াত্তীনি ওয়ায্যাইতুন' (৯৫:৮) পাঠ করেন।[৫] কখনো তিনি দীর্ঘ বিস্তীর্ণ (طوال المفصل) এবং নাতি দীর্ঘ (أوساط) সূরা পাঠ করতেন। কখনো তিনি ﴿الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ﴾ সূরা মুহাম্মদ (৪৭:৩৮) পাঠ করতেন।[৬] আবার কখনো 'আত্তূর (৫২:৪৯)[৭] এবং কখনো 'আল মুরসালাত' (৭৭:৫০) পড়তেন। এই (শেষোক্ত) সূরাটি তাঁর জীবনের সর্বশেষ ছালাতে পাঠ করেন।[৮] তিনি কখনো উভয় রাক'আতে সর্বাপেক্ষা দুটি দীর্ঘ সূরার মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সূরা[৯] 'আল-আরাফ' (৭:২০৬) উভয় রাক'আতে পাঠ করতেন।[১০] আর

---

[৯] আহমাদ ও মুসলিম।

[১] বুখারী ও মুসলিম।

[২] বুখারী ও মুসলিম।

[৩] বুখারী ও মুসলিম।

[৪] ছহীহ সনদে নাসাঈ ও আহমাদ।

[৫] ছহীহ সনদে ত্বায়ালিসী ও আহমাদ।

[৬] ইবনু খুযাইমা (১/১৬৬/২) ও ত্বাবারানী এবং মাক্বদিসী ছহীহ সনদে।

[৭] বুখারী, মুসলিম।

[৮] বুখারী ও মুসলিম।

[৯] এখানে ﴾طولى﴿ শব্দটি ﴾أطول﴿ এর স্ত্রী লিঙ্গ, আর ﴾الطوليين﴿ শব্দটি হচ্ছে ﴾طولى﴿ শব্দের দ্বিবচন। দীর্ঘ দু'টি সূরা হচ্ছে 'আল-আ'রাফ' ঐকমত্যে ও 'আল-আনয়াম' সমধিক প্রাধান্য যোগ্য মতে। (ফতহুল বারী)

[১০] বুখারী, আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমা (১/৬৮/১) আহমাদ, সাররাজ ও মুখাল্লিছ।

কখনো কখনো উভয় রাক'আতের 'আল-আনফাল' (৮:৭৫) পাঠ করতেন।[১]

القراءة في سنة المغرب
মাগরিবের সুন্নত ছালাতে ক্বিরা'আত

তিনি মাগরিবের ফরয পরবর্তী সুন্নত ছালাতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরুন' (১০৯:৬) ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (১১২:৪) পাঠ করতেন।[২]

صلاة العشاء
৫। ইশা'র ছালাত

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইশার প্রথম দু'রাক'আতে মুফাছ্ছাল অংশের মধ্যম সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৩] তিনি কখনো 'ওয়াশ্ শামসি ওয়াযুযুহা-হা' (৯১:১৫) বা অনুরূপ সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৪] কখনো 'ইযাস্সামা-উন শাক্কাত' (৮৪:২৫) পাঠ করতেন এবং এর ভিতর সাজদাহ করতেন।[৫] একবার তিনি সফরে প্রথম রাক'আতে ওয়াত্তীনি ওয়ায্ যাইতূন (৯৫:৮) পাঠ করেন।[৬] তিনি এই ছালাতে কিরা'আত দীর্ঘ করতে নিষেধ করেছেন।

আর এ নিয়ম তখনই করেছিলেন যখন ঃ

صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه، فقال : إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد

---

[১] ত্বাবারানী ছহীহ সনদে «الكبير» গ্রন্থে।
[২] আহমাদ, মাক্বদিসী, নাসাঈ, ইবনু নছর ও ত্বাবারানী।
[৩] ছহীহ সনদে নাসাঈ ও আহমাদ।
[৪] আহমাদ ও তিরমিযী– তিনি একে হাসান বলেছেন।
[৫] বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ।
[৬] বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ।

أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ ب ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ و ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ●

মুয়া'য (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে ইশা'র ছালাত আদায় করেন। তিনি কিরা'আত দীর্ঘ করলে একজন আনছারী ছাহাবী জামা'আত ছেড়ে দিয়ে একাকী ছালাত পড়েন। মুয়াযকে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেন– সে মুনাফিক হবে। লোকটি এ সংবাদ জানার পর আল্লাহর রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা জানাল। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ হে মুয়ায! তুমি কি ফিৎনাবাজ হতে চাও? যখন লোক জনের ইমামত করবে তখন পড়বে 'ওয়াশ্‌শামসি ওয়াযু যুহা-হা' (৯১ঃ১৫) 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' (৭৭ঃ১৯) 'ইক্ব্‌'রা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক' (৯৬ঃ১৯) 'ওয়াল্লাইলি ইযা-ইয়াগশা' (৯২ঃ২১) কেননা তোমার পিছনে বৃদ্ধ, দুর্বল ও (অদম্য) প্রয়োজন বিশিষ্ট লোক ছালাত পড়ে।[১]

صلاة الليل

৬। রাতের নফল ছালাত

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো এ ছালাতে সরবে কিরা'আত পড়তেন আবার কখনো বা নীরবে পড়তেন[২] কখনো সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতেন আবার কখনো লম্বা সূরা পড়তেন। কোন সময় বেশী লম্বা করে ফেলতেন। এমনকি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل : وما هممت؟ قال : هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم ●

আমি এক রাতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছালাত পড়ি, তিনি এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলেন যে, এক পর্যায়ে আমি একটি

---

[১] বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ, এটা الإرواء গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (২৯৫)
[২] ছহীহ সনদে নাসাঈ।

মন্দ পরিকল্পনা করে ফেলেছিলাম। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কী পরিকল্পনা করেছিলেন? তিনি বললেন ঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বাদ দিয়ে বসে পড়ার পরিকল্পনা করেছিলাম।[১]

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح « البقرة » فقلت : يركع عند المائة، ثم مضى فقلت : يصلي بها في (ركعتين)، فمضى، فقلت : يركع بها، ثم افتتح « النساء » فقرأها، ثم افتتح « آل عمران » فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع...... الحديث ❁

আমি এক রাতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছালাত পড়ি। তিনি 'সূরা বাকারা' দিয়ে শুরু করলেন। আমি মনে মনে বললাম, একশত আয়াত পূর্ণ করে হয়ত রুকু করবেন, কিন্তু না– তিনি অতিক্রম করে গেলেন। আমি বললাম, হয়ত একে দুই রাক'আতে ভাগ করে পড়বেন– কিন্তু তাও না, তিনি পড়তে থাকলেন। এবার ভাবলাম এটা শেষ করে বোধ হয় রুকু করবেন, না তিনি সূরা 'নিসা' শুরু করলেন এবং পুরোটাও পড়ে ফেললেন। এরপর 'আ-লু ইমরান'[২] ধরলেন ও পাঠও সম্পন্ন করলেন। তিনি থেমে থেমে তা পাঠ করছিলেন। আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপক আয়াত আসলে তিনি পবিত্রতা জ্ঞাপন করতেন। আবেদন মূলক আয়াতে আবেদন করতেন। আশ্রয় ভিক্ষার আয়াতে আশ্রয় ভিক্ষা করতেন। অতঃপর রুকূ করেন........আলহাদীছ।[৩]

এক রাতে ব্যথিত শরীর নিয়েও তিনি লম্বা ৭টি সূরা পাঠ করেন।[৪]

---

(১) বুখারী ও মুসলিম।

(২) এভাবেই রিওয়ায়াত এসেছে 'নিসা' 'আলু-ইমরান' এর পূর্বে। এতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উসমানী কুরআনের সিরিয়াল ভঙ্গ করা বৈধ। পূর্বেও এমন কথার উল্লেখ হয়েছে।

(৩) মুসলিম ও নাসাঈ।

(৪) আবু ইয়ালা, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী ঐকমত্য পোষণ করেন। অপর বর্ণনায় « الطول » শব্দ এসেছে। ইবনুল আসীর বলেন ঃ যম্মা দ্বারা « طولى » এর বহু বচন যেমন « كبرى » এর বহু বচন « كبر » সাতটি দীর্ঘ সূরা হচ্ছে– 'আল-বাক্বারা' 'আলু-ইমরান' 'আন্-নিসা' 'আল-মা-ইদা' 'আল-আন'আম' 'আল-আ'রাফ' 'আত্-তাউবাহ'।

কখনো তিনি এগুলো হতে একটি করে সূরা প্রত্যেক রাক'আতে পাঠ করতেন।[১]

ماعلم أنه قرأ القرآن كله في ليلة (قط) ●

আদৌ একথা জানা যায়নি যে, তিনি এক রাত্রে পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন।[২] বরং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ বিষয়ে অনুমতি দেননি। তাকে বলেছিলেন ঃ

«اقرأ القرآن في كل شهر» قال: قلت : إني أجد قوة قال : «فاقرأه في عشرين ليلة» قال : قلت : إني أجد قوة، قال : «فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك»

প্রত্যেক মাসে একবার কুরআন পড়বে, তিনি বলেন, আমি বললাম– আমি তার চেয়েও বেশী শক্তি রাখি। তখন তিনি বললেন ঃ তবে বিশ রাত্রে তা পড়বে। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি আরো ক্ষমতা অনুভব করি। তিনি বললেন ঃ তবে এক সপ্তাহে, এর উপরে যাবে না (তথা এর চেয়ে কম সময়ে খতম দিবে না)।[৩]অতঃপর তাকে পাঁচ দিনের অনুমতি দেন[৪] এবং পরবর্তীতে তিন দিনেরও অনুমতি দেন[৫] এবং এর চেয়ে কমে পড়তে তিনি তাকে নিষেধ করেন।[৬] তিনি তাকে এর কারণ দর্শাতে যেয়ে বলেছেন ঃ

لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، وفي لفظ : لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ●

যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়বে সে তা বুঝতে সক্ষম হবে না।[৭] অপর শব্দে এসেছে ঐ ব্যক্তি কুরআন বুঝে না যে তিন দিনের কমে তা পড়ে।[৮]

---

[১] ছহীহ সনদে আবূ দাউদ, নাসাঈ।
[২] মুসলিম ও আবূ দাউদ।
[৩] বুখারী ও মুসলিম।
[৪] নাসাঈ ও তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।
[৫] বুখারী ও আহমাদ।
[৬] দারিমী, সাঈদ বিন মানছুর স্বীয় «سنن» গ্রন্থে ছহীহ সনদে।
[৭] ছহীহ সনদে আহমাদ
[৮] দারিমী, তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

অতঃপর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

«فإن لكل عابد شِرَّةً، ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة، وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك»

প্রত্যেক ইবাদতকারীর রয়েছে তেজদীপ্ততা।[১] আর প্রত্যেক তেজস্বিতার রয়েছে স্থিরতা আর এর শেষ পরিণতি হয় সুন্নাতের প্রতি হবে, অন্যথায় বিদ'আতের প্রতি হবে। যার স্থিরতা সুন্নাতের প্রতি হবে সে হিদায়াত পাবে; পক্ষান্তরে যার স্থিরতা অন্য কোন কিছুর প্রতি হবে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।[২]

তাইতো নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতেন না।[৩] তিনি বলতেন ঃ

---

(১) «شِرَّة» শিন সাকিন ও রা-তাশদীদ যুক্ত হবে এর অর্থঃ কর্ম তৎপরতা ও মনোবল। যৌবনের «شِرَّة» তেজস্বিতা হচ্ছে প্রাথমিক ও তেজদীপ্ত মুহূর্ত।

ইমাম ত্বাহাবী বলেন ঃ এটি বিভিন্ন বিষয়াভ্যান্তরস্থ সেই তেজদীপ্ততা– যা মুসলিমগণ তাদের মহান প্রতি পালকের নৈকট্য অর্জনের বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে নিজেদের ভিতর থাকা কামনা করেন। আর রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক্ষেত্রে তাদের তেজদীপ্ততা থাকা পছন্দ করেছেন। তবে ঐ তেজদীপ্ততা নয় যা থেকে তাদের ক্ষান্ত থাকা উচিত এবং যা তা থেকে অন্য কিছুর দিকে বের করে নিয়ে যায়।

আর তিনি এসব নেক আমলকে মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যেগুলো নিয়মিত পালনের বৈধতা রয়েছে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» অর্থ আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম আমল হচ্ছে– নিয়মিত আমল যদি তা কমও হয়।

আমি (লেখক) বলতে চাই ঃ এই হাদীছটি যাকে শুরুতে ইমাম ত্বাহাবী «روى» অর্থাৎ বর্ণিত হয়েছে বলেছেন তা বিশুদ্ধ– যাকে বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন– আইশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে।

(২) আহমাদ ও ইবনু হিব্বান স্বীয় «صحيح» গ্রন্থে।

(৩) ইবনু সা'দ (১/৩৭৬) ও আবুশ শাইখ «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم» (২৮১)

« من صلى في ليلة بمائتي آية، فإنه يكتب من القانتين المخلصين »

যে ব্যক্তি রাত্রে দু'শত আয়াত পড়ার মাধ্যমে ছালাত আদায় করবে সে « قانتين مخلصين » একনিষ্ঠ অনুগতদের তালিকায় লিখিত হবে।[১]

তিনি প্রত্যেক রাত্রে সূরা 'বানী ইসরাঈল' (১৭:১১১) ও সূরা 'যুমার' (৩৯:৭৫) পাঠ করতেন।[২] তিনি বলতেন :

« من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين »

যে ব্যক্তি রাত্রে এক শত আয়াত পড়ার মাধ্যমে ছালাত আদায় করবে সে গাফিলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হবে না।[৩] কখনো তিনি প্রত্যেক রাক'আতে পঞ্চাশ বা ততোধিক আয়াত পাঠ করতেন।[৪] কখনো বা "ইয়া আইয়ুহাল মুয্যাম্মিল" (৮৩:২০) এর পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করতেন।[৫]

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কদাচিৎ ছাড়া পূর্ণ রাত্রি ছালাত পড়তেন না।[৬]

আব্দুল্লাহ বিন খাব্বাব বিন আরত্ব (যিনি রাসূলের সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ নেন) রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এক রাত্রে ফজর পর্যন্ত (ইবাদতরত থাকতে) লক্ষ্য করেন, অপর বর্ণনায় ছালাত পড়তে দেখেন। যখন তিনি স্বীয় ছালাত শেষে সালাম ফিরালেন তখন খাব্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন : হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার পিতা মাতা উৎসর্গ হউক– আজ রাতে আপনি এমন ছালাত পড়েছেন যা আর কোন দিন পড়েননি? তিনি বলেন :

---

[১] দারিমী, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[২] আহমাদ, ইবনু নাছর, ছহীহ সনদে।

[৩] দারিমী, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[৪] বুখারী ও আবূ দাউদ।

[৫] ছহীহ সনদে আহমাদ ও আবূ দাউদ।

[৬] মুসলিম ও আবূ দাউদ।

«أجل إنها صلاة رغب ورهب وإني سألت ربي عزوجل ثلاث خصال، فأعطاني اثنين ومنعني واحدة : سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا (وفي لفظ : أن لايهلك أمتي بسنة)، فأعطانيها، وسألت ربي عزوجل أن لايظهر علينا عدوا من غيرنا، فأعطانيها، وسألت ربي أن لايلبسنا شيعا، فمنعنيها»

হ্যাঁ এটি ছিল আশা ও ভয়ের ছালাত। আমি (এই ছালাতে) আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি বস্তু চেয়েছিলাম যার দুটি আমাকে দিয়েছেন এবং একটি দেননি। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট চেয়েছি, তিনি যেন পূর্বেকার জাতিকে যে কারণে ধ্বংস করেছেন সে কারণে আমাদেরকে ধ্বংস না করেন (অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস না করে দেন)। তিনি ইহা দান করেছেন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট এই দু'আ করেছি যে, তিনি যেন আমাদের উপর বিজাতীয় শত্রুকে বিজয়ী না করেন। তিনি

আমি (লিখক) বলতে চাই ঃ এ হাদীছটিসহ অন্যান্য হাদীছের আলোকেই সর্বদা বা অধিকাংশ সময় পূর্ণ রাত জেগে ইবাদত করা মাকরুহ। কেননা এটা সুন্নতের বিপরীত। যদি পূর্ণ রাত্রি জেগে ইবাদত করা উত্তম হত তবে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা ছাড়তেন না। আর সর্বোত্তম নির্দেশনা হচ্ছে– মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশনা।

ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে যে কথা প্রচলিত আছে যে, তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ইশার উযূ দিয়ে ফজর পড়েছেন তা শুনে ধোঁকায় পড়া চলবে না। কেননা এর কোন ভিত্তি নেই। বরং আল্লামা ফিরুজ আবাদী (রহঃ) «الرد على المعترض» (১/৪৪) কিতাবে বলেন ঃ এটি স্পষ্ট মিথ্যা সম্ভারের একটি ঘটনা যার সম্বন্ধ ইমাম সাহেবের দিকে করা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা এতে কোন উল্লেখযোগ্য মর্যাদা প্রমাণিত হয় না। বরং তাঁর মত ইমামের পক্ষে উচিত ছিল উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করা। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ছালাতের জন্য উযূ নবায়ন করা উত্তম ও পরিপূর্ণ কাজ। তাও তখনকার ব্যাপার যখন তাঁর একাধারে চল্লিশ বৎসর রাত্রি জাগরণ সাব্যস্ত হবে। বস্তুত এমনটি অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। যা কিছু অজ্ঞ ও গোড়া লোকেদের কপোলকল্পিত অবান্তর কাহিনী মাত্র যা আবু হানীফাসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে রটনা করেছে। বস্তুত এসবই হচ্ছে মিথ্যা।

আমাকে এটা দিয়েছেন। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আরো দু'আ করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত না করে দেন, কিন্তু এটি কবুল করেননি।[১]

পূর্ণ এক রাত্রি তিনি একটি আয়াত বারংবার পাঠ করে করে ফজর পর্যন্ত গড়িয়ে দেন। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

অর্থাৎ যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে ওরাতো তোমারই দাস আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমিতো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৫ঃ১১৮)

এই আয়াতটি তিনি রুকূতে পড়েন, সাজদাতে পড়েন এবং এর মাধ্যমে দু'আও করেন। সকাল হলে আবূ যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি গত রাতে এই একটি মাত্র আয়াত ফজর পর্যন্ত পড়তে থেকেছেন। রুকূ, সাজদা এবং দু'আতে এটাই পড়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে পূর্ণ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে কেউ এ রকম করলে আমরা তা আপত্তিকর ভাবতাম। তিনি বললেন ঃ আমি আমার প্রভুর নিকট আমার উম্মতের জন্য সুপারিশাধিকার আবেদন করি ফলে তিনি আমাকে তা দান করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না সে ইনশাআল্লাহ্ তা লাভ করবে।[২]

এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী রয়েছে যে রাত্রিকালীন ছালাত পড়ে তবে সে তাতে ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (১১২ঃ৪) ব্যতীত অন্য কোন কিরা'আত পড়ে না; এটাই বারবার পাঠ করে, অতিরিক্ত কিছুই পড়ে না। অভিযোগকারী যেন একে অপর্যাপ্ত মনে করেছে। আল্লাহর নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ

«والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن»

---

[১] নাসাঈ, আহমাদ, ত্বাবারানী (১/১৮৭/২) এবং তিরমিযী একে ছহীহ বলেছেন।

[২] নাসাঈ, ইবনু খুযাইমা (১/৭০/১) আহমাদ, আবু নাছর ও হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন আর যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

ঐ সত্ত্বার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে এই সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।[১]

صلاة الوتر

৭। বিত্‌রের ছালাত

كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الاولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ (٨٧ : ١٩)، وفي الثانية ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ (١٠٩ : ٦)، وفي الثالثة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ (١١٢ : ٤)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল 'আলা'। (৮৭ঃ১৯) দ্বিতীয় রাক'আতে 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' (১০৯ঃ৬) এবং তৃতীয় রাক'আতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' (১১২ঃ৪) পড়তেন।[২] কখনো সূরা ইখলাছের সাথে তৃতীয় রাক'আতে 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' (১১৩ঃ৫) ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স' (১১৪ঃ৬) যোগ করতেন।[৩]

একবার বিতরের (বেজোড়) রাক'আতে তিনি সূরা 'নিসা' (৪ঃ১৭৬) থেকে একশত আয়াত পাঠ করেন।[৪] বিতর ছালাতের পরের দু'রাক'আতে[৫]

---

[১] আহমাদ ও বুখারী।

[২] নাসাঈ ও হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ্ বলেছেন।

[৩] তিরমিযী, আবুল আব্বাস আল আছম স্বীয় 'হাদীছ' গ্রন্থে (২য় খণ্ড ১১৭ নং), হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ্ বলেছেন ও যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৪] নাসাঈ ও আহমাদ ছহীহ্ সনদে।

[৫] এই দু'ই রাক'আত পড়া ছহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে সাব্যস্ত আছে তবে এ দু'রাক'আত পড়া অপর আরেকটি হাদীছের বিপরীত হয়। তা হচ্ছে– «اجعلوا آخر صلوتكم بالليل وترا» অর্থাৎ তোমাদের রাত্রিকালীন ছালাতের সর্ব শেষে বিতরকে রাখবে। আলিমগণ উভয় হাদীছের মধ্যে সমতা বিধান করতে গিয়ে মত বিরোধ করেছেন কিন্তু এর কোনটাই আমার নিকট প্রাধান্য যোগ্য মনে হয়নি। পূর্বোক্ত আদেশের উপর আমল করতে গিয়ে সতর্কতা স্বরূপ দু'রাক'আত না পড়ায় শ্রেয়, আল্লাহ সর্বজ্ঞ। ===

'ইযা-যুলযিলাত' (৯৯:৮) ও 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফিরুন' পাঠ করতেন।[১]

صلاة الجمعة

জুমু'আহ্'র ছালাত

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ـ أحيانا ـ في الركعة الأولى بسورة «الجمعة» (٦٢ : ١١)، وفي الأخرى : ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾ (٦٣ : ١١)، وتارة يقرأ ـ بدلها : ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ﴾ (٨٨ : ٢٦)

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো প্রথম রাক'আতে সূরা 'জুমু'আহ্' (৬২:১১) পড়তেন এবং পরের রাক'আতে 'ইযা-জা-আকাল মুনাফিকুন' (৬৩:১১) পড়তেন।[২] কখনো এর পরিবর্তে 'হাল আতা-কা হাদীছুল গাশিয়াহ' (৮৮:২৬) পড়তেন।[৩] কখনো প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা' (৮৭:১৯) ও দ্বিতীয় রাক'আতে 'হাল আতাকা' পড়তেন।[৪]

তবে পরবর্তীতে আমি একটি বিশুদ্ধ হাদীছ অবহিত হই যাতে বিত্‌রের পরে দু'রাক'আত পড়ার আদেশ রয়েছে, অতএব কাজের সাথে আদেশ সংযুক্ত হয়ে প্রত্যেকের জন্য এই দু'রাক'আত পড়া সাব্যস্ত হল। এমতাবস্থায় (বিতর সংক্রান্ত) প্রথম নির্দেশ তথা হাদীছটিকে শেষে রাখাটা মুসতাহাব এ অর্থে নিতে হবে। ফলে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। আমি বিতরের পরে দু'রাক'আত আদেশসূচক হাদীছ «الصحيحة»(১৯৯৩) তে উদ্ধৃত করেছি। আল্লাহর তাউফীক দানের উপর তাঁর যাবতীয় প্রশংসা।

(১) আহমাদ, ইবনু নাছর, ত্বাহাবী (১/২০২) ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান, হাসান ছহীহ্ সনদে।

(২ ও ৩) মুসলিম ও আবূ দাউদ, এটি «الإرواء» গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। (৩৪৫)

(৪) মুসলিম ও আবূ দাউদ।

صلاة العيدين

দুই ঈদের ছালাত

• كان ﷺ يقرأ أحيانا في الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الأخرى : ﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ •

• وأحيانا يقرأ فيهما ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ (٥٠ : ٤٥) و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ (٥٤ : ٥٥)

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো ঈদের ছালাতের প্রথম রাক'আতে "সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা" পড়তেন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে "হাল আতাকা" পড়তেন।[১]

আবার কখনো দুই রাক'আতে "ক্বা-ফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ" (৫০:৪৫) ও "ইক্বতারাবাতিস্ সা'আহ" (৫৪: ৫৫) পড়তেন।[২]

صلاة الجنازة

জানাযার ছালাত

সুন্নত হচ্ছে ঐ ছালাতে "সূরা ফাতিহা" পাঠ করা[৩] এবং সেই সাথে অপর একটি সূরা পাঠ করা।[৪] আর তা নিম্নস্বরে প্রথম তাকবীরের পরে পাঠ করতেন।[৫]

(১ ও ২) মুসলিম ও আবূ দাউদ।

(৩) এটি হচ্ছে ইমাম শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক প্রমুখগণের মত। আর পরবর্তী হানাফী মুহাক্কিক (তথ্যান্বেষী) কিছু আলিমও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফাতিহার পর অপর আরেকটি সূরা মিলানো শাফি'ঈদের একটি দৃষ্টিভঙ্গি আর এটিই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

(৪) বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনুল জারূদ। অতিরিক্ত অংশটি শাজ (নগণ্য) নয় যেমনটি তুওয়াইজিরী ধারণা করেছেন। (দেখুন মূল কিতাবের ভূমিকা ৩০-৩২ পৃষ্ঠা)

(৫) নাসাঈ ও ত্বাহাবী ছহীহ সনদে।

ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

ধীর গতিতে ও সুললিত কণ্ঠে কিরাআত পাঠ

كان صلى الله عليه وسلم -- كما أمره الله تعالى -- يرتل القرآن ترتيلا،

لا هذًا ولا عجلة، بل قراءة، «مفسرة حرفا حرفا، حتى «كان يرتل السورة

حتى تكون أطول من أطول منها»

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করতেন। তাড়াহুড়া বা ঝটপট করে নয় বরং অক্ষর, অক্ষর করে সুস্পষ্টভাবে তিনি কুরআন পাঠ করতেন।[১] তিনি এমনি ধীরস্থিরভাবে কুরআন পাঠ করতেন যে, তাতে সূরা দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘতর হয়ে যেত।[২]

তিনি বলতেন ঃ

«يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا،

فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها»

কুরআনধারীকে বলা হবে পড়তে থাক যেভাবে দুনিয়াতে ধীরস্থিরভাবে পড়তে এবং উপরে উঠতে থাক। তোমার অবস্থানস্থল সেখানেই হবে, যেখানে সর্বশেষ আয়াতটি পাঠ করবে।[৩]

তিনি মাদের (টেনে পড়ার) অক্ষরে টেনে পড়তেন। «بسم الله» আল্লাহ শব্দ টেনে পড়তেন «الرحمن» এর মীমকে টেনে পড়তেন «الرحيم» এর ইয়াকে টেনে পড়তেন।[৪] «نضيد» এর «ي» ইয়াকে[৫] এবং এ ধরনের মদের

---

[১] ইবনুল মুবারক «الزهد» কিতাবে (১৬২/১) «الكواكب» (৫৭৫) থেকে, আবূ দাউদ ও আহমাদ, ছহীহ সনদে।

[২] মুসলিম ও মালিক।

[৩] আবূ দাউদ ও তিরমিযী এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন।

[৪] বুখারী ও আবূ দাউদ।

[৫] বুখারী, «أفعال العباد» গ্রন্থে ছহী সনদে।

স্থানগুলোতে টেনে পড়তেন। তিনি আয়াতের শেষ মাথায় থামতেন যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে।[১]

তিনি কখনো স্বীয় স্বরকে (তরঙ্গ সদৃশ) ক্রমাগতভাবে প্রবাহিত করতেন[২] যেমন মক্কা বিজয়ের দিন করেছিলেন। তিনি তখন উষ্ট্রীর উপর কোমল কণ্ঠে সূরা ফাত্‌হ (৪৮ঃ২৯) পড়ছিলেন।[৩] আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল তাঁর পুনরাবৃত্তিকে এভাবে উল্লেখ করেন (آ آ آ)।[৪] তিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন পাঠের নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ

« زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا »

অর্থঃ তোমরা কুরআনকে তোমাদের কণ্ঠ দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত কর কেননা সুললিত কণ্ঠস্বর কুরআনের সৌন্দর্য বর্ধক।[৫] তিনি আরো বলতেন ঃ

---

(১) সূরা ফাতিহা পাঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। (পৃষ্ঠা ৬৪)

(২) يرجع শব্দটি (ترجيع) তারজী শব্দ থেকে রূপান্তরিত। হাফিজ ইবনু হাজার বলেন ঃ এটা (ترجيع) কুরআন পাঠের সময় হরকতসমূহ উচ্চারণের টান কাছাকাছি হওয়া, এর মূল কথা হচ্ছে পুনরাবৃত্তি করা। স্বরকে পুনঃ পুনঃ আওড়ানো বলতে কণ্ঠ নালীতে তাকে ক্রমাগতভাবে ছাড়া বা প্রবাহিত করা বুঝায়। মানাওয়ী বলেন ঃ এটা সাধারণত প্রশান্তি ও উৎফুল্ল অবস্থায় হয়ে থাকে। নবী মুছতফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিনে এমনটি পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেন।

(৩) বুখারী ও মুসলিম।

(৪) হাফিয ইবনু হাজার তার (آ آ آ) কথার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ যবর যুক্ত হামযা, তার পরে সাকিন যুক্ত আলিফ অতঃপর অপর হামযা। শাইখ আলী আলক্বারী অন্যদের থেকেও একই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেন, স্পষ্টত এগুলো তিনটি আলিফ মামদূদাহ মাত্র।

(৫) মুআল্লাক বা সনদবিহীনভাবে বুখারী, আবু দাউদ, দারিমী, হাকিম ও তাম্মাম রাযী দু'টি ছহীহ ছহীহ্‌ সনদে।

জ্ঞাতব্য ঃ প্রথম হাদীছটি কোন কোন বর্ণনাকারীর নিকট উলট-পালট হয়ে যায় ফলে তিনি বর্ণনা করেন- 'زينوا أصواتكم بالقرآن' অর্থঃ তোমরা কুরআন দ্বারা স্বীয় কণ্ঠস্বরকে সুন্দর কর। এটা বর্ণনাসূত্র ও মর্ম উভয় দিক দিয়ে স্পষ্ট ভুল। তাই যে ব্যক্তি একে বিশুদ্ধ বলেছেন তিনি ভুলে নিমজ্জিত হয়েছেন। কেননা এটা অত্র বিষয়ের ব্যাখ্যাদানকারী অনেক বিশুদ্ধ হাদীছ বিরোধী বরং এটা উলট-পালট হাদীছের দৃষ্টান্ত হওয়ার যোগ্য। বিস্তারিত আলোচনার জন্য «الأحاديث الضعيفة» (৫৩২৮) দ্রষ্টব্য।

«إن من أحسن الناس صوتًا بالقرآن، الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله»

ঐ লোকের কুরআন পাঠের সুর সর্বাপেক্ষা সুন্দর যার পাঠ শ্রবণে তোমাদের মনে হয় যে, সে আল্লাহকে ভয় করছে।[১]

তিনি সুর দিয়ে কুরআন পড়তে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন ঃ

«تعلموا كتاب الله، وتعاهدوه، واقتنوه، وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده، لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل»

তোমরা আল্লাহর কিতাব শিখ, এর সাথে লেগে থাক ও একে আঁকড়িয়ে ধরে রাখ এবং সুললিত কণ্ঠে পাঠ কর। ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, রশি দিয়ে উট বেঁধে রাখা অপেক্ষা কুরআন মনে রাখা কঠিন।[২]

তিনি আরো বলতেন ঃ «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»

যে ব্যক্তি ভাল স্বরে কুরআন পড়েনা সে আমার দলভুক্ত নয়।[৩]

তিনি আরো বলতেন ঃ

«ما أذن الله لشيء ما أذن (وفي لفظ : كأذنه) لنبي (حسن الصوت (وفي لفظ : حسن الترنم) يتغنى بالقرآن (يجهر به)»

---

[১] হাদীছটি ছহীহ, ইবনুল মুবারক «الزهد» গ্রন্থে (১৬২/১) «الكواكب» ৫৭৫ থেকে। দারিমী, ইবনু নাছর, ত্বাবরানী, আবু নুআইম «أخبار أصبهان» গ্রন্থে ও আয্‌যিয়া «المختارة» গ্রন্থে।

[২] দারিমী ও আহমাদ, ছহীহ সনদে। এখানে «المخاض» শব্দের অর্থ হচ্ছে উট। «العقل» শব্দের অর্থ হচ্ছে ঐ রশি যেটা দিয়ে উট বাঁধা হয়।

[৩] আবূ দাউদ, হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী এতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

জ্ঞাতব্য ঃ অত্র স্থানে উল্লেখিত হাদীছের সনদ নিয়ে আব্দুল ক্বাদির আরনাউত্ব ও তার সহযোগী কর্তৃক শাইখ আলবানীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত একটি আপত্তি এবং শাইখ আলবানী কর্তৃক তার খণ্ডনমূলক পর্যালোচনা সম্বলিত একটি দীর্ঘ টীকা ছিল। পাঠকের সুবিধার্থে তার অনুবাদ করা হলনা। (অনুবাদক ও সম্পাদক)

আল্লাহ তা'আলা নবী কর্তৃক সুর দিয়ে কুরআন পাঠ যেভাবে শ্রবণ করেন সেভাবে অন্য কোন কথা শ্রবণ[১] করেন না।[২]

তিনি আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন ঃ গত রাত্রে আমি যখন তোমার কুরআন পাঠ শ্রবণ করছিলাম তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে, নিঃসন্দেহে তুমি দাঊদ (আলাইহিস্ সালাম)-এর সুমধুর সুর[৩] প্রাপ্ত হয়েছ। এতদ শ্রবণে আবূ মূসা বলেন ঃ যদি আমি আপনার উপস্থিতি টের পেতাম তাহলে আপনার উদ্দেশ্যে সুরকে আরো সুন্দর ও আবেগ পূর্ণ করে তুলতাম।[৪]

الفتح على الإمام

ইমামের প্রতি উন্মোচন বা লুক্বমাহ্ দান

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমামের ক্বিরাআত পাঠে জটিলতা সৃষ্টি হলে তা উন্মোচন করে দেয়া সুন্নাহ্ সম্মত করেছেন।

«صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي : أصليت معنا؟ قال : نعم، قال : (فما منعك (أن تفتح علي)»

---

(১) মুনযিরী বলেন ঃ «أذن» (ذ) যালের নীচে যের দিয়ে অর্থ হবে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সুমধুর সুরে কুরআন পাঠকারীর পড়া শ্রবণের ন্যায় লোকজনের কথা শ্রবণ করেন না। সুফইয়ান বিন 'উয়াইনা ও অন্যান্যদের মধ্যে যারা বলেন «تغنى بالقرآن» অর্থঃ কুরআন দ্বারা অমুখাপেক্ষিতা অনুভব করা এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যাত।

(২) বুখারী, মুসলিম, ত্বাহাবী, ইবনু মান্দাহ «التوحيد»। (৮১/১)

(৩) আলিমগণ বলেন ঃ এখানে «مزمار» দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুললিত কণ্ঠ। (যদিও) এর প্রকৃত অর্থ গান। «آل داؤد» বলতে এখানে স্বয়ং দাউদ আলাইহিস সালামকেই বুঝানো উদ্দেশ্য। কখনো কখনো ওমুকের পরিবার বলে তাকেই বুঝানো হয়ে থাকে। দাউদ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন দারুন সুন্দর সুরের অধিকারী। ইমাম নববী একথা মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন।

(৪) এখানে «تحبير» শব্দের অর্থ হচ্ছে সুরকে সুন্দর ও আবেগপূর্ণ করা 'নিহায়াহ'। আব্দুর রায্যাক আল্-'আমালী' গ্রন্থে (২/৪৪/১) বুখারী, মুসলিম, ইবনু নাছর ও হাকিম।

তিনি তাঁর কোন এক ছালাতের কিরা'আতকালে তাতে এলোমেলো হয়ে যায়। ছালাত শেষে উবাই নামক ছাহাবীকে বললেন ঃ তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত পড়েছ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ তবে আমাকে জটিলতামুক্ত করতে কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দান করেছে।[১]

الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة

কুমন্ত্রণা ঠেকাতে আ'ঊযুবিল্লাহ পাঠ ও থুথু নিক্ষেপ

«قال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه : يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي؟ فقال رسول الله ﷺ ذاك شيطان يقال له : خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، واتفل، على يسارك ثلاثا، قال : ففعلت ذلك فأذهبه الله عني»

'উছমান বিন আবুল আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ছালাত ও কির'আতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আমার ক্বিরা'আতে জটিলতা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ এ হচ্ছে শয়তান, যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। তুমি তার আগমন অনুভব করলে, আল্লাহর নিকট তিনবার আশ্রয় কামনা করবে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু[২] ফেলবে। তিনি (উছমান) বলেন ঃ এর পর থেকে আমি এমনটি করি ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন।[৩]

---

[১] আবূ দাঊদ, ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী, ইবনু আসাকির (২/২৯৬/২) আযযিয়া 'আলমুখতারাহ' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদে।

[২] এখানে « اتفل » শব্দটি « التفل » থেকে উদ্গত হয়েছে যার অর্থঃ ঈষৎ থুথুসহ ফুৎকার প্রদান করা যা « نفث » অপেক্ষা বেশী ('নিহায়াহ')।

[৩] মুসলিম ও আহমাদ, ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন ঃ এ হাদীছে শয়তানের কুমন্ত্রণার সময় আ'ঊযুবিল্লাহ পড়ে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

الركوع

রুকূ প্রসঙ্গ

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিরা'আত শেষে একটু বিরাম নিতেন।(১) অতঃপর তিনি হস্তদ্বয় তাকবীরে তাহরীমায় উল্লেখিত নিয়মানুসারে উত্তোলন করতেন(২) এবং আল্লাহু আকবার(৩) বলে রুকূ করতেন।(৪) এই দুই বিষয়ে (তাকবীর ও রুকূ) তিনি ছালাতে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

إنها لاتتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله...... ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع، ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي......

(১) আবূ দাউদ, হাকিম- তিনি একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাতে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এই বিরামের পরিমাণ ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্যগণ নির্ণয় করেন যে, এটা একবার শ্বাস নেয়ার সম পরিমাণ।

(২,৩ ও ৪) বুখারী ও মুসলিম, আর এ ক্ষেত্রে রফউল ইয়াদাইন (হস্ত উত্তোলন) ও রুকূ থেকে উঠা কালে হস্ত উত্তোলন মুতাওয়াতির (বহু সংখ্যক বর্ণনাকারীর) হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। এটা হচ্ছে তিনজন ইমাম- মালিক, শাফিঈ আহমাদ বিন হাম্বল ও অধিকাংশ মুহাদ্দিছ এবং ফকীহগণের মত। ইবনু আসাকির এর বর্ণনা অনুযায়ী (১৫/৭৮/২) ইমাম মালিক এর উপরেই মারা যান। হানাফীদের মধ্যে কেউ কেউ এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ এর শিষ্য 'ইছাম বিন ইউসুফ আবু ইছমাহ বালখি (২১০) এর বর্ণনা ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে পৃষ্ঠা- ৩৮ আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ স্বীয় পিতা থেকে 'মাসাইল' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬০) বর্ণনা করেছেন। উকবা বিন আমির থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, ছালাতে প্রত্যেকবারের হস্ত উত্তোলনে দশটি করে পুণ্য রয়েছে। আমি বলতে চাই এ কথার পক্ষে একটি হাদীছে কুদসী সাক্ষ্য বহন করে তা হচ্ছে- 'ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة' অর্থাৎ- যে ব্যক্তি একটি পুণ্যের নিয়ত করতঃ তা পালন করবে তার জন্য দশ থেকে সাত শত পর্যন্ত পুণ্য লিখা হয়। বুখারী, মুসলিম, ছহীহ তারগীব (১৬)

তোমাদের কারো ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ভালভাবে ওযূ করবে অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে তাঁর প্রশংসা ও মহত্বের গুণ-কীর্তন করবে এবং কুরআন থেকে আল্লাহর শিখানো ও অনুমোদিত অংশ হতে যা সহজ তা পাঠ করবে। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ করবে ও এমতাবস্থায় স্বীয় হস্তদ্বয় উভয় হাঁটুর উপর স্থাপন করবে– যাতে দেহের জোড়াগুলো শান্তশিষ্ট ও স্থির হয়ে যায়......... আল হাদীছ।[১]

صفة الركوع
রুকূর পদ্ধতি

«وكان ﷺ يضع كفيه على ركبتيه»

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাই হি ওয়াসাল্লাম) রুকূতে স্বীয় হাঁটুদ্বয়ের উপর হস্তদ্বয় রাখতেন।[২] এবং তিনি এজন্য নির্দেশ দিতেন।[৩] তিনি ছালাতে ত্রুটিকারীকেও এ বিষয়ে আদেশ করেন যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ হয়েছে। তিনি অঙ্গুলিগুলোর মাঝে ফাঁক রাখতেন[৪] হস্তদ্বয়কে হাঁটুদ্বয়ের উপর স্থাপন করতেন; দুই হাঁটুকে আঁকড়ে ধরার মত করে[৫] এ বিষয়ে তিনি ছালাতে ত্রুটিকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

«إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه»

যখন তুমি রুকূ করবে তখন তোমার হস্তদ্বয় উভয় হাঁটুর উপর রাখবে এবং

---

[১] আবূ দাঊদ ও নাসাঈ, হাকিম একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সমর্থন করেছেন।

[২ ও ৪] বুখারী ও আবূ দাঊদ।

[৩] বুখারী ও মুসলিম।

[৫] হাকিম এবং তিনি একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী এবং তায়ালুসী ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি ছহীহ আবূ দাঊদে উদ্ধৃত হয়েছে। (৮০৯)

অঙ্গুলিগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে অতঃপর এমন সময় পর্যন্ত থামবে যাতে প্রত্যেকটি অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির হতে পারে।[১]

তিনি কনুই দু'টোকে পাঁজর দেশ থেকে দূরে রাখতেন।[২] তিনি রুকু কালে পিঠকে সমান করে প্রসারিত করতেন।[৩] এমন সমান করতেন যে, তাতে পানি ঢেলে দিলেও তা যেন স্থির থেকে যাবে।[৪] তিনি ছলাতে ত্রুটিকারীকে বলেছিলেন ঃ

অতঃপর যখন রুকু করবে তখন স্বীয় হস্তদ্বয় হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখবে এবং পিঠকে প্রসারিত করে স্থিরভাবে রুকু করবে।[৫] তিনি পিঠ অপেক্ষা মাথা উঁচু বা নীচু রাখতেন না।[৬] বরং তা মাঝামাঝি থাকত।[৭]

وجوب الطمأنينة في الركوع
রুকুতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন ফরয

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শান্ত শিষ্টভাবে রুকু করতেন। আর ছলাতে ত্রুটিকারীকেও এ বিষয়ে নির্দেশ দান করেছেন। যেমনটি পূর্বের অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ হয়েছে। তিনি বলতেন ঃ

«أتموا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم»

তোমরা রুকু এবং সাজদা পরিপূর্ণভাবে আদায় কর। ঐ আল্লাহর শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে আমি তোমাদেরকে পিছন থেকে[৮] দেখে থাকি যখন তোমরা রুকু ও সাজদাহ্ কর।[৯]

---

[১] ইবনু খুযাইমাহ ও ইবনু হিব্বান স্ব-স্ব ছহীহ গ্রন্থে।

[২] তিরমিযী এবং ইবনু খুযাইমাহ একে ছহীহ বলেছেন।

[৩] বাইহাক্বী ছহীহ সনদে ও বুখারী।

[৪] ত্বাবারানী 'আল কাবীর' ও 'আছ ছাগীর' গ্রন্থে এবং আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ 'যাওয়াইদুল মুসনাদ' গ্রন্থে ও ইবনু মাজাহ।

[৫] ছহীহ সনদে আহমাদ ও আবূ দাউদ।

[৬] আবূ দাউদ, বুখারী ছহীহ সনদে 'জুযউল কিরাআত' গ্রন্থে। «لايقنع» শব্দের অর্থ– তিনি স্বীয় মাথাকে এমন পরিমাণ উপরে উঠাতেন না যাতে মাথা পিঠ অপেক্ষা উপরে থাকে– 'নিহায়াহ'।

[৭] মুসলিম ও আবূ আওয়ানাহ।

[৮] এখানে بعد শব্দটি وراء শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি অপর হাদীছে এসেছে। আমি বলতে চাই ঃ এই দেখা প্রকৃতই ছিল যা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযা ছিল। এটা শুধু ছলাতাবস্থার জন্য নির্দিষ্ট। সর্বাবস্থায় এমনটি হওয়ার উপর কোন প্রমাণ বহন করে না।

[৯] বুখারী ও মুসলিম।